



ପ୍ରମିଳା-୨/୧୦

ଭୂମି କଳା



Durga Puja 2014 Issue
11th - 12th October, 2014
<http://www.milonee.net>
milonee@milonee.net



মিলনী কমিটির পক্ষ
থেকে আপনাদের
সকলকে জানাই
শুভ বিজয়ার
প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা

Milonee Executive Committee

Raghu & Soma Bhattacharya
Rathin & Mira Basu
Joydeep & Anuradha Mukherjee
Souvik & Tuhina Nandi
Kaushik Dam & Arjita Ghosh
Avi Purkayastha & Arundhuti Guha
Malay Nandi & Sarita Misra
Siddhartha & Gayatri Baral
Sourav & Priyanka Sinha
Subhadeep & Baishakhi Chakraborty
Suman & Priya Dutta
Ratul Bhawal
Bidisha Sen
Tripureshwar Chattopadhyay
Debayan Majumdar

Durga Puja 2014 - Nirghonto

October 11th - Sosthi, Saptami & Astami

10:00 AM - Puja starts

12:00 PM - Puspanjali

5:15 PM - Sandhyarati

October 12th - Nabami & Dashami

10:00 AM - Puja starts

12:00 PM - Puspanjali

1:30 PM - Thakur Boron

Puja Performed by

Joydip Bhaumik

Ananyo Bandhopadhyay



II সূচীপত্র Contents II



From the President's Desk	Raghu N Bhattacharya	3
ছোটদের ক্যান্ড্যাস		
The Dance	Roshni Nandi	5
Bubbles & Rainy Day	Ronit Sanyal	5
My Groovy Adventures	Avishek Ghosh	6
Are we too dependent on technology?	Kritika Krori	7
Art	Rayan Das, Ishani Bhaumik, Anaya Nandi, Madha Pan, Rajarshi Bose, Shreasha Halder	
কবিতা (Poems)		
Quiet Afternoon	Roshmi Bhaumik	12
পরবাস	দূর্বা দাশ	13
ওরা চলে গেল	তীর্থ চৌধুরী	13
তিনটি ছুট অধ্যায়	রমা সাহা	18
ভাসান	অমিত নাগ	20
অপেক্ষমান	দূর্বা দাশ	21
স্বর্গের সিঁড়ি	রথীন বসু	21
কলকাতা যাওয়ার আগে	অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়	23
হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার	কৃষ্ণেন্দু কুমার দাস	32
বিচার চাই	মাকসুদা আইরীন মুকুল	32
পরাজিত মানুষের হেটে চলা	রাসেল সাদ্দিদ	39
রচনা		
একদা শিশুর কিছু অনুভূতি ও উপলব্ধি	অভিজিৎ সেনগুপ্ত	9
Indian Rail	Krishnendu Das	12
The Mango Tree	Rashmi Sanyal	14
Hinduism 106---Thoughts on Prayer & Meditation	Mita Mukherjee	15
What is the best thing about your life?	Rashmi Sanyal	17
Victoria Memorial	Krishnendu Das	21
A SILENT NIGHT—in Luanda	Mita Mukherjee	22
বেড়া	মোহাম্মদ ইরফান	24
Kolkata Street Food – Phuchka and Churmur	Roshmi Bhaumik	33
মৃত্যুঞ্জয়	কৃষ্ণেন্দু কুমার দাস	36
Feline Philosophy	Rathin Basu	40
সিনাইয়ের সূর্যোদয়	গৌতম সরকার	42
Art is not what you see, but what you make others see	Shohini Ghosh	47



জগতে আনন্দযজ্ঞে সবার আমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন.....

শারদোৎসবের দিনগুলিতে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর আশীর্বাদে, আপনারা সকলেই সুখী ও সুস্থ থাকুন - এই কামনা জানাই। মায়ের আবাহন, আমাদের প্রবাসী মনকে গৃহমুখী করে তুলেছে, উদগ্রীব করে তুলেছে - কিন্তু আমরা আমাদের পেশাগত কাজের মায়াজালে জড়িয়ে সেই ডাকে সারা দিতে পারছিলাম। কিন্তু আমরা 'মিলনী'-র মাধ্যমে প্রবাসেই, 'মা'-কে আমাদের সন্তানদের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।

যেদিন 'মিলনী'র পত্তন হয়, সেদিন 'মিলনী'-র মনোভাব ছিল 'ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ নই। জানি আমি ভাবী বনস্পতি'। বিগত বছরগুলি ধরে আমরা, আমাদের 'মিলনী'-কে বিভিন্ন পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পস্থা-র মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি। তার হামসফরের সাক্ষী আমরা সবাই। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের আদরের 'মিলনী' একটি ক্ষুদ্র চারাগাছ থেকে ধীরে ধীরে এক বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে - যার ছায়ায় থেকে আমরা প্রবাসী বাঙালীরা দেশের মাটির রূপ-রস-গন্ধ পাই।

আমি এটা দেখে খুশী যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আমাদের চোখের সামনেই শুধুমাত্র শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিনত হয়েছে, তাই নয় - তাদের মানসিক পরিনতি, তাদের তারুণ্য, তাদের মধ্যে নিত্য-নব ধ্যানধারণার ও উদ্ভাবনী শক্তি, দায়িত্ব গ্রহণের মতো পরিনতি বোধ, দুর্গাপূজা সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাদের উৎসাহ-উন্মাদনা আমাকে অভিভূত করেছে। এটা খুবই আনন্দের। তারা আরো বেশি করে সক্রিয় অংশ নিন, এটা আমার একান্ত ইচ্ছা। 'মিলনী' প্রতি বছর ধরেই শারদোৎসব উদযাপনে বৈচিত্র্য আনার জন্য অনুষ্ঠানস্থল, কর্মসূচী, প্রীতিভোজ, সবকিছুতেই পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা আমাদের সকল সামর্থ্য নিয়ে পূজার দিনগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে এসেছি - যারা আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। এই বছরেও আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'রূপঙ্কর বাগচী ও সম্প্রদায়ের' বাংলা ব্যান্ড নিয়ে আসছি। আশা করব সকলের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি আরো বেশী আকর্ষণীয় হবে।

আমি এটা দেখে অত্যন্ত আপ্লুত যে 'মিলনী'-র প্রতি তার সদস্যদের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র তো কমেই নি, বরং আরো বেশি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা 'মিলনী'-র সাফল্যের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। আমি এর জন্য গর্ভিত। আমাদের মধ্যে যারা প্রবীন, অভিজ্ঞ, তারা তাদের মূল্যবান পরামর্শ, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন - আমরা সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছি - অন্যদিকে আমাদের কিশোর / তরুন প্রজন্ম তাদের আবেগ, উৎসাহ, উন্মাদনা দিয়ে 'নব যুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজল' - এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'মিলনী'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। এই শুভ প্রচেষ্টার জয় হোক।

নবীনের - প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত 'মিলনী' আজ এমন একটা বৃহৎ পরিবারে পরিনত হয়েছে - যেখানে প্রবীন সদস্যরা অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছেন - অন্যান্য সদস্যরা এখন এই বৃহৎ পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে আমরা পরের সাফল্যে নিজেদের সাফল্যমন্ডিত মনে করি, পরের খুশীতে নিজেরাও খুশীতে রঙ্গীন হই। আবার অন্যদিকের পরের দুঃখে অংশীদারী হয়ে, তার দুঃখ লাঘব করতে সচেষ্ট হই।

এই সংঘের প্রেসিডেন্ট হওয়াটা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে সম্মানিত ও গর্ভিত করেছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নে আমি কার্যকরী সমিতির সকল সদস্য এবং সমস্ত সাধারণ সদস্যের বিপুল সহযোগিতা

পেয়েছি। তাদের সহযোগীতায় আমি অভিভূত, আমি কৃতজ্ঞ। তাদের অকপট সহায়তায় আমি বিগত বছরটিতে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি। কতটা কি পেয়েছি, সেটা বিচার করবেন 'মিলনী'-র সদস্যরা। কোন কৃতিত্ব থাকলে, তার দাবীদার কার্যকরী সমিতির ও সাধারণ সদস্যদের - দোষ ক্রটি থাকলে দায়িত্ব আমার।

আমি আশা করব আমার উত্তরসূরির আমলেও 'মিলনী'-র জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। নতুন সমিতি তাদের সকল সামর্থ্য, তারুণ্য, সকল শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলুক - আমরা তার এবং তাদের পাশে দাঁড়াবো। 'মিলনী' হয়ে উঠুক আমাদের সকলের মিলন মেলায় প্রাঙ্গণ। আপনাদের সকলকে আমার সর্কৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য
প্রেসিডেন্ট
'মিলনী', কলোরাডো
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতি অনন্যা মুখার্জী, কলকাতা

শ্রী অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্ত্তাহার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

Our sincere thanks to

Upal Sengupta for the cover page



Upal Sengupta was born on 23rd October and is a founding member of the band Chandrabindoo. He is a lead vocalist as well as composer for the band. He is an art college graduate and is a great painter and renowned for his work in the cartoon world.

Aindrila Saha for pandal design

Aindrila Saha has just completed her Masters in Microbiology and is vying a career in academia and research. She is also an accomplished Odissi dancer and an artist



*PUJA GREETINGS TO
ALL MY INDIAN
FRIENDS*



Your Handyman
Wayne Morse
Call (303) 877-7148

FREE ESTIMATE
I TAKE PRIDE IN A JOB WELL DONE
NO JOB IS TOO LITTLE

The Dance

Roshni Nandi – 10 years

I looked out the window of the car. “The weather today is cold and damp.” I sighed to my friend, Tanya. I was tired of watching SpongeBob. “Don’t you have anything else?” I pleaded. Tanya shook her head no. In approximately thirty minutes we arrived. I never wanted to watch SpongeBob for that long crammed in a car. I was relieved that we were at our destination, The Dance at Broomfield Auditorium. Still it would have been better if I stayed home...

Tanya’s mom told me that the dance was led by my dance teacher, Ms. Sangeeta Varma. Next, we took some seats in the back row. I had no idea why. There were a lot of people. Most of the time I just saw heads bobbing up and down. About thirty minutes later, there was a break. I hopped out of my seat excitedly. I munched on my jalapeno sandwich. My tongue was on fire like forest fire but I didn’t care. Besides, it was bright and sunny. After break, I trudged back to my seat. My eyes became tired of *trying* to watch the dancers. Slowly my eye lids began to drop. “Cha, cha, cha” the bells of the dancers rung “Cha, cha cha.” Eventually I fell asleep.

When I woke up some people have already left, but there was still a lot of people. Ms. Sangeeta was handing out trophies. “There are a few people from the audience I would like to call to the stage.” Ms. Sangeeta said in Hindi. “What?!” I thought. In her hands were two glistening trophies.

“Roshni,” she called. I straightened up. “Was it me? Was she going to call me? What was going to happen next? Was I prepared for whatever was going to happen next?” I frantically thought. Just then, something came to me. I relaxed. I was cool as a cucumber. She probably wasn’t going to call me. “Nandi, Tania Roy.” I was called. Me!! Any friend of course. We stumbled across the long steep aisle. A helper showed us to a door that led outside. When we were outside, I got the chills. We slid to a door that led back stage. A woman in a sari pushed us towards the stage. Ms. Sangeeta gave us our trophies. “Congratulations” she said. I smiled.

I was so surprised that you could tip me over with chicken feather. The trophy was a foot long and on the top there were three shooting stars. In the middle it was black, pink, orange, and yellow. I noticed something on the bottom. It said “Roshni Nandi 2011.” Soon the program was over. We headed back to the car. Taniya smiled at me. I smiled back.



Art by ***Ishani Bhaumik – 9 years***

Bubbles

Ronit Sanyal – 6 years

Hi I am a six year old boy. I have a fish. Its name is Bubbles and its a betta fish. He is orange and blue. He can talk. He talks about bugs. He talks mostly about roly polly and ants. He wants to know if they have legs and eyes. I feed Bubbles gold fish food. One day his tank got so dirty that he almost died. But, he didnt. I like watching him play. He doesn't have eyelids so he cannot blink. I wish Bubbles would stay with me forever. Love you Bubbles.

Rainy Day

Ronit Sanyal – 6 years

Once upon a time, there was a boy. His mom asked him to get some worms so that they can go fishing. The boy went outside to find worms. It was raining and the boy forgot his umbrella at home and got lost. He found some worms because the "bird with an umbrella" helped him find some worms, and his dog found him and showed him the way to home and they lived happily ever after.



Art by **Rayan Das**



Art by **Rajarshi Bose**

My Groovy Adventures

Avishek Ghosh – 11 years

Hi my name is Avishek Ghosh and this year, *I turned 11 and now going on 12*. I can now participate in many activities that I have been thinking about doing all these years! I am so thankful and excited about having done all of these many activities this year, that now I am going to tell you about all of them!

One of the things I did is skiing. It was my first time skiing so I felt scared, excited and very cold. It was on Valentine's Day that I went to Eldora Ski Resort along with my dad and my mom. We rented our skies. The skis and boots were really heavy and on my first run, I fell from their weight. My second time on the slopes, I came down side ways unable to turn my skis. Then I got the flow of gliding down the slope and managing my skis. I decided to use the poles to give me balance and direction and I ended up doing many, many runs as I was on the beginner's hill. After that experience, I really want go ski again. My parents were at the bottom of the hill taking pictures and videos. My dad tried his new snow shoes and went on a back country hike as I was skiing. The weather turned bad and as the snow flurries started, I finished skiing and waited with my mom in the lodge for my dad to return. Then we picked up my sister from Boulder, ate dinner and returned home.

During my Spring Break we visited Puerto Vallarta, Mexico. Before we went, I did my research on the internet and found out about many things I wanted to do there – whale watching, swimming with dolphins, snorkeling to see the coral reefs, ride on a zip line, do a jungle hike and swim in a natural pool under a waterfall.

The first thing we did in Puerto Vallarta was to take a boat cruise in the big crescent shaped Banderas Bay around Puerto Vallarta to watch whales. It was the last day before all the humpback whales set off to Alaska and other cold water places. The end of March is the end of the season for whale watching, as the whales that came down from Alaska to spend the winter in the warmer waters of South America, start to return back. We saw a baby whale and his mom swimming and flipping their tails. My mom and dad saw two whales jump out and flip their tails and but I was too busy taking pictures. The baby whale went under our boat and created a mirror (a mirror is where a diving whale creates a calm circle where a reflection can be seen).

Our tour guide told us interesting facts about whales like how I can crawl inside of a blue whale's heart and the interesting habits they have. It was a cool experience for me because I love animals.

After the whale watching experience I did something my sister has always wanted to do but has not done yet – *"to swim with a dolphin"*. We visited Vallarta Adventures where they raise and train



dolphins. I was so excited to be in the pool with the dolphins the whole entire time. There were two dolphins in our pool as we went in. A dolphin came to my side at the direction of his trainer. I touched the dolphin and I was so surprised because the dolphin's skin was so smooth like a person. I wonder who moisturizes their skin every day. The dolphin kissed me and I kissed the dolphin back. The trainer and I made hand gestures that made the dolphin sing. I also gave it a hug and the dolphin danced with me.

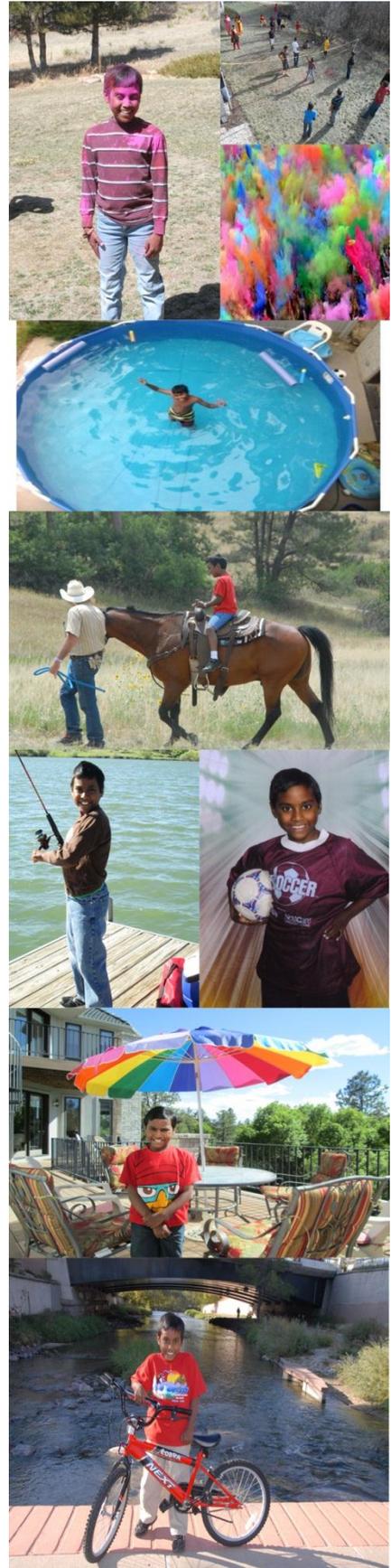
The last thing I did was to see the dolphin race with another dolphin around the pool. The dolphins shook up the pool water so much that it seemed like an elephant had just jumped into the pool! After that experience I am bound to do it with my kids.

One more of my great experiences was a jungle tour. We took the "Jungle Trio" tour and got on a large tour bus and went into the jungle around Puerto Vallarta. We stopped to see iguanas, flowers, plants, and tropical fruits.. Then we stopped at a small village to visit a Tequila factory and ate lunch by a river. I saw tadpoles and tried to catch them. I had to go into the river and tried countless times to catch them with a plastic bag, but all I ended up with was wetting my hands and feet. After eating we went back to our hotel and my dad and I went into the hotel pool to cool down, as the jungle hike left me very hot. That day was the mostly educational for me as I spent a lot of time with nature and saw a variety of flora and fauna.

The next day, we took another boat cruise and stopped at a cove near Los Arcos Islands in Banderas Bay, close to the old town of Puerto Vallarta. It was just the end of March and the water was still very cold! My dad was too afraid to go into that cold water. I had to jump in and when I did, I got shocked from the cold. I withstood the cold and I stayed in the water the whole time to see the corals and colored fish swimming around the islands. Before we left for the cruise, my dad bought me an underwater camera so I could take pictures of the fish.

After the snorkeling, we cruised our way to a beach where we did not get off the boat. We continued on the boat to the next inlet cove and started our jungle hike. We had to take a long hike to get to the natural waterfall and pool. The waterfall had fish in it and I took pictures of the fish with my underwater camera. We ate fish, rice, tortilla, and beans for lunch at a restaurant facing the bay. Finally, we got back on the boat and then we realized that the kid's park to do the zip lining was near the first beach, where we did not get off!

So I missed doing the zip line on this trip, but did have a lot of fun at the jungle waterfall and swimming in the natural pool. After coming back from Mexico we threw a Holi party at our home in the Pinery! It was my first holi party. This was my first time playing holi with lots of different colors of "abir". It was a lot of fun. We played



holi and then cleaned up and changed clothes and played volleyball. We all had good Indian food. I played in seven volleyball matches. The holi was good and mostly outside in our backyard, but our bathroom also looked like some people played holi in it!

Now that I am home for the summer, I have only my usual activities to keep me busy during the summer – swimming, horse riding in the Pinery, fishing at Bingham Lake, soccer, biking and hanging around the house with my dad. The almost daily fishing trips to Bingham Lake has made me well aware of all the nooks and inlets there and I am able to catch one – big or small - everytime. This knowledge gave me the edge as I participated in the 2014 Pinery Fishing Derby on August 2nd and caught the biggest crawfish and was awarded the trophy for my catch. While I have won several medals and ribbons in the past, this was my first every Trophy! I was so excited to get my fishing trophy! I hope you come and visit our house and taste “*my fresh catch of the day*”, as I am sure to continue my fishing adventures.

The last of my first ever adventures this year was a trip to Unser Racing Adventures to participate in a kart race. I drove the kart over 30 miles per hour and took second place in my race. Before I could drive, I had to go through their kids training and receive my license. I have always been wanting to try my hand at driving and for the first time I drove all by myself. It was so much fun!

These are all of my first time experiences of this year. As I go back to school, I am still reminded of all the new adventures that I have had this year. I hope all of you also get to do some of these adventures too.





Art by **Anaya Nandi** – 5 years



Art by **Ishani Bhaumik** – 9 years

Are we too dependent on technology?

Kritika Krori - Age 15 years

In our schools and workplaces today, there are more uses of technology than ever before. Over time, more and more people in the world's population start to depend on technology every day. All these technology necessities spark this question: Are we too dependent on technology? Humans need to get away from technology because too much dependency on it leads to declining health, leads to a decrease in social interaction, and leads to a loss of academic curiosity.

First off, humans need to stay away from technology because of the bulge in declining health. According to WebMD, "one of the most common ways to wreck your back is by sitting in front of a computer, with your back hunched forward" (How to Wreck Your Back). As a result of this, more people have to start seeing the doctor or go to physical therapy. All this technology use is destroying the posture of an ordinary person. Another thing is that nowadays, "doctors are now prescribing digital detoxes" (Tahseen) to patients who are constantly using technology and has taken a toll on their health. A digital detox is a treatment in which the patient is to stay away from technology as much as possible to avoid further damaging their health. Technology has become so popular that "society is pushed on technology to keep their jobs" (Clinton). Since our workforces require so much use on technology, it can take a serious toll on their health.

Secondly, humans need to give a wide berth to technology because it advances a decrease in social interaction. As reported by The Times of India, "technology makes relationships less personal". As an example, cyber lawyer Prashant Mali says: "college students aren't directly interacting with each other anymore because they are more concerned about their virtual friends than reality". Due to the invention of social media outlets such as: Twitter, Instagram, Facebook, and Tumblr, people are more occupied with chatting and sharing important events online, rather than communicating in person. As a consequence, only using technology to communicate, social interactions between human beings is diminishing.

Lastly, humans need to steer clear of technology because it gives rise to a loss of academic curiosity. The "younger generation will never experience what it is like to know how to build something with their bare hands" (Clinton). According to Mary Ann Sala, who writes for Kaleidoscope, "the younger generation has lost its curiosity to explore the world. Instead they are hiding behind a computer screen or Xbox game." The younger kids of today won't be as curious, as it will not be until years later when they will be developing into young adults. Technology has affected the children of the world greatly, to the point that every child will have a lesser desire to learn anything new. "Laziness is a part of people becoming too dependent on technology" (Clinton).

To sum everything up, humans need to avoid being overly dependent on technology for three reasons. The first one is that technology leads to declining health. People are now using digital detoxes as medication for their declining health. The second reason is that relationships are made less personal. People are too busy hiding behind a computer screen to see what is actually going on. The final reason is that there is a loss of academic curiosity in the younger generation. Curiosity will never become known to mankind if this dependence on technology keeps growing.



Shuvo Bijoya

*May Goddess Durga
bring Happiness and
Prosperity to you and your
Family.*

Colorado Songwala, 2014

একদা শিশুর কিছু অনুভূতি ও উপলব্ধি

অভিজিৎ সেনগুপ্ত (ই মেল ~ abhijit.1.sengupta@gmail.com)

বাণ্শীয় শকটের (স্টীম ইঞ্জিন)কাঠের সিটে বসে এক ছ'বছরের শিশু জানলা দিয়ে গাছ-পালাকে পিছনদিকে ছুটে নিবিষ্টমনে দেখছে এমন সময় চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ল। তখন অন্ধকার তার ছায়া ফেলেছে~ মা'র তাগাদায় সে শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ চোখ বুজে ছিল মনে নেই, কখন যেন একটানা শোঁ-শোঁ শব্দে তার চোখ খুলে গেল - দেখল পূবের আকাশ একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসছে। তার ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে - নাম পড়ল - **পার্বতীপুর** জংশন। সারি-সারি রেল লাইন, তার কয়েকটার উপর ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে - ফোঁসফোঁসানি তাদেরই -যেন একএকটা পাগলা ঘোড়া - ছুটবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই স্বপ্নটা তাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও উদাস করে তোলে। মনে পড়ে, ছুটিতে-ছুটিতে দিনাজপুরে মামাবাড়িতে যাওয়ার কথা। পার্বতীপুরের পরে সারাব্রীজের উপর দিয়ে বিশাল চওড়া পদ্মাপার করে সেই সফর। মামাবাড়িতে অনেক অনেক আত্মীয়-স্বজন- অনেকেই তার সমবয়সী। কতো ছোটো-ছোট, কতো আবদার, কতো নিরীহ সাধারণ 'এক্কা-দোক্কা'-র মত খেলা-ধুলা, টক কাঁচা আম নুন-লঙ্কা মেখে খেয়ে দাঁত টকিয়ে ফেলা। তক্ষক ও গোসাপের ভয় পেরিয়ে বন-জঙ্গলের কাঁঠাল গাছের তলা দিয়ে বাথরুম যাওয়া।

সব-কিছুর মধ্যে নিবিড়তা, সারল্য, কোমলতা, আন্তরিকতা, সাবলীলতা, অকৃত্রিমতা - নির্মল আনন্দের মেধুর স্মৃতি, যেন গতজন্মের।

ছিল না টেলিফোন, ছিল না রেডিও - যানের মধ্যে ছিল পাতি রিকশা।

যদিও উত্তম-সুচিত্রা-হেমন্ত-সন্ধ্যা ইত্যাদি শিল্পীদের কীর্তিগুলির সঙ্গে তার পরিচয় বাল্যকালে, তবুও সে যেন আরও এক জেনারেশন অতীতের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপিয়ে সে যে কাননবালা, রবীন মজুমদারের গান নিবিষ্টমনে শুনে শুনে শিখত, সেটাই তাকে সেই ভোররাতে ইঞ্জিনগুলোর শোঁ - শোঁ শব্দের সাথে কীরকম একটা এ্যাসোসিয়েশন ঘটিয়ে দেয় :

--'চাঁদের আলোর দেশে গো, রামধনুকের দেশে, স্বপ্নদিয়ে একখানি ঘর বাঁধব ভালবেসে। কোন স্বপনপুরের পারে শুধু তুমি হবে রাণী, জ্যোছনা দিয়ে রাঙিয়ে দেবো তোমার আঁচলখানি, ওগো রাণী....'

--'নীলপরী স্বপ্নে জাগলো রে জাগলো....'

---'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়, একে থাক কারও ছবি। সে কথা ভুলিয়া যেয়ো, ভুলিয়া যাবে কী সবি।

যদি কোনও ভালবাসা, কিছু আলো, কিছু আশা - একে থাকে মনে গভীর স্বপনে, ক্ষণিক মিলন রবি। সে কথা ভুলিয়া যেয়ো.....।।

'মনে রবে কি গো কত রাত, কত প্রাতে - ছায়াসঙ্গিনী যে ছিল, কে ছিল তোমারই সাথে। বিরহের মিলে, তাহারি নিখিলে বিরাম লভিতে সবি। সে কথা ভুলিয়া যেয়ো...'

---'শ্যামলের প্রেম, যেন নয়নের জল, সখি হে। বাঁধিতে পারে না আঁখি, তবু ভাবি চেয়ে থাকি..... '

এই শিল্পীরা ছিলেন একাধারে অভিনেতা ও গায়ক। গানগুলির কথা ও সুর, চমকহীন, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত, আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের ঘনঘটা অনুপস্থিত। চাপল্য আছে, কিন্তু অগ্রহণযোগ্য চটুলতা নেই। বাঙালীর স্বাভাবিক ভাবুক কবি মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আজও একাকী বিনীত রজনীয়াপন মুহূর্তগুলিতে আর্তিভরা মন যেন কোনও হারিয়ে যাওয়া দেশের উদ্দেশ্যে ভেসে চলে - হৃদয় কোনও অজানা অনুভূতির ছোঁয়ায় হয়ে ওঠে আকুল-উদ্বেল। তার কাছে অধুনাতন স্বার্থময়, ভোগসর্বস্ব, জটিল জীবনযাত্রা আনে গ্লানি, গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে চলার বিরুদ্ধে শরীর-মন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়।

বাঙালীর পরিচয় কেবল তার মেধাতে নয়, তার অনুভূতিপ্রবণতায়, ত্যাগ-মনোবৃত্তিতে, ভাষার সৌকর্যে, ঔদার্যে, আদর্শবাদিতায়। তার শিল্পী-ভাবুক মন তাকে যে সৃষ্টিতে প্রেরণা দেয়- তা তুলি-কলমে, সঙ্গীতে অনৈসর্গিক সুরের ঠিকানার। টাকার খলি তাকে সত্যিকারের আকর্ষণ করে না। বাঙালীর কলকারখানা নির্মাণ দেশগঠনের তাগিদে - যেমন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

বাঙালীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার স্বার্থলেশহীন - যেমন, আচার্য জগদীশচন্দ্র।

বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালীর খ্যাতি বিশ্বজোড়া : কবিতা ও সাহিত্যসৃষ্টিতে - কত নাম বলব!

সঙ্গীতে : আলাউদ্দীন, রবিশঙ্কর, নৃত্যে: উদয়শঙ্কর, যাদুবিদ্যায়: পি সি সরকার, দেহ-সৌষ্ঠবে: মনোতোষ রায়, বিষ্ণু ঘোষ, মনোহর আইচ, সন্তরণে:মিহির সেন, আরতি ঘোষ, বিজ্ঞানে: সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, অঙ্কনে: অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চলচ্চিত্রে: সত্যজিৎ--যে দিকেই তাকাই, সবদিকেই।

শিক্ষার অঙ্গনে - সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যুগের আচার্য অতীশ দীপঙ্কর থেকে, বিদ্যাসাগর।

রাজনীতির অঙ্গনে চরম উৎকর্ষতা ও নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার উদাহরণ: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র সমাজ-সংস্কার ও চরিত্রগঠনে: রামমোহন, বিদ্যাসাগর।

আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশ ও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে : শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ।

সবার উপরে স্বমহিমায় বিরাজমান: রবীন্দ্রনাথ।

কী শিক্ষকতায়, কী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে, কী চিকিৎসাবিদ্যায়, কী ওকালতিতে ~ সসাগরা ভারতব্যাপী সর্বত্র বাঙালী ছিল নিজ নিজ প্রতিভার গুণে স্বপ্রতিষ্ঠিত। পেশার বাইরেও তার শিল্পীমন পরবাসে প্রকাশ পেয়েছে ~ শিল্পে, সঙ্গীতে ~ যেমন : অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, যাযাবর, জরাসন্ধ, বনফুল।

অবশিষ্ট ভারতবাসী বাঙালীর গরিমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ভাগ করে চরম দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে - তা আমাদের কাটিয়ে ওঠার মত যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে- কেবল আত্মসচেতনতা ও মনোবলকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাবার ও পরস্পরকে সক্রিয় সমর্থনের অপেক্ষা।

এখনও বাঙালীর প্রতিভা বিশ্বমাঝে মহিমাম্বিত, কেবল- কী ঘরে, কী বাইরে, তার অবহেলা আছে, স্বীকৃতি নেই।

এখন প্রয়োজন, আত্মসচেতনতার, হীনমন্যতা পরিত্যাগ করার, আর যার যার যে যে বিষয়ে স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি আছে, তাকে অবলম্বন করে উৎকর্ষতালাভের জন্য যত্নবান হওয়ার।

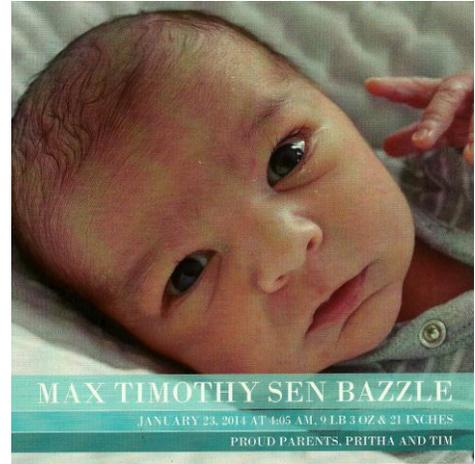
আজকের অন্তঃসারশূন্য প্রতিযোগিতামূলক ভোগবাদ বাঙালীর স্বাভাবিক চরিত্রের বিরোধী।

নকলনবিশী না করে স্বাভাবিক উৎকর্ষের সাধনা কী বাঙালীর আরাধ্য আর হওয়া সম্ভব নয় ?

সেদিনের সেই শিশু আজ বার্ষিক্যে উপনীত হয়ে ভাবে যে, বিশ্বজয় করার উপযোগী নেতৃত্বের পিছনে দাঁড়াবার সুযোগ বিধাতা আমাদের দিয়েছিলেন - আক্ষেপ, আমরা তা হেলায় হারাতে দিয়েছি। তাই আমরা দেশভাগের বলি হয়ে শরীরে-মনে দারিদ্র্য-উপহাস-পরনির্ভরশীল হয়ে গ্লানিময় জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা-নিরত।



Flowers by Shreesha Halder – 8 years



My Grandson Max T. S. Bazzle was born on January 23rd, 2014 in Boston, Massachusetts. The proud parents are Pritha Sen and Timothy E. Bazzle. Max's Grandpa and Grandma are Donald E. Bazzle and Diane N. Bazzle. Max has two aunts. His 'Mashi' is Priyanka Sen and 'Pishi' is Lisa Bazzle. His Dadu and Dida are Pankaj Sen and Banasri Sen.

Max is a lovely, handsome, cheerful and friendly boy with beautiful smile. He is my "Prince Max."

The Durga Puja ceremony in 2014 is Max's first Durga Puja. Although he is in Boston, we are praying to Goddess Durga and her family to bless our grandson Max for a healthy, prosperous, and long life.

My "Prince Max", with love and blessings,

Your Dida



Indian Rail by *Krisnendu Das*

QUIET AFTERNOON

Roshmi Bhaumik

Glassy shimmering sheet of green,
Edges lined frothy slime between,
Rows of tall spiky upright blades,
Bulrushes with brown sausages.

Black-yellow intricate design,
Lively dragonfly settles awhile,
Warm moist richness brings,
Fluttering heart-shaped wings.

Small dark swarms in the air,
Tiny gnats vying for their share,
A honking flock of geese,
Arrive without prior notice.

A sudden drop, just a plop,
Concentric rings spread atop,
In the middle, bubbles stirred,
Floating pearls come apart.

Gentle breeze rhythmic heaves,
Dark and bright excited leaves,
Far away from hustle bustle,
Hearing leaves softly rustle.

Birds chirping sweet melodies,
Cotton waves on pale blue seas,
Subtle awareness of presence,
A picture of blissful coexistence.

পরবাস দূর্বা দাশ

কাল রাতেই কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে।
এত দূর থেকে, এত গুলো দেশ আর সমুদ্র পেরিয়ে,
আমি রোজ সময় মতন পৌঁছে যাই তোমার ঘরে-
আর তুমি রোজই নতুন করে অবাক হও!
তোমায় গল্প শোনাই,
এদেশের রাস্তাঘাট, বড় বড় বাজার হাট,
ধুলোবালিহীন নির্মল হাওয়া-
তুমি গল্প শুনে অবাক হও!
তোমায় বলি বরফ পড়ছে, তুমি ভয় পাও
ঠান্ডা না লেগে যায়! জানতে চাও-
এখানে বাসন কি করে মাজে, কাপড় কিভাবে কাচে?
এখানে কত সুখ, কত আরাম, কত স্বাস্থ্য!
বলো তোমার নাকি পোড়ার দেশ-
মা! আমায় তোমার পোড়ার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?
ছোটবেলায় লেপের তলায়, আরাম করে-
আমায় তুমি রূপকথা শোনাতে, আর ছুঁইয়ে করলে বলতে,
দৈত্য এসে ধরে নিয়ে যাবে, আর কিন্তু ফিরতে হবে না।
আমি তো তোমার লক্ষী মেয়ে ছিলাম !

এখানে আমার সোনার পালং, রুপোর গেলাস, চূণির মেঝে-
মা, আমায় তোমার পোড়ার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?



ওরা চলে গেল তীর্থ চৌধুরী

ওরা চলে গেল।

দিয়ে গেল শুধু অণু পরমাণুর হিসেব,
বলে গেল অনেক যন্ত্রের কার্জকরী নিয়ম।
দিয়ে গেল অনেক কঠিন অঙ্কের সমাধান,
বলে গেল জীবন-কোষের পরিচয় লিপি।
দিয়ে গেল দূর গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান,
বলে গেল সহস্র ঔষধের উপাদান।
ওরা চলে গেল।

তবে কি হল?

ওরা কি জেনে গেল মহা পৃথিবীর মহা মন্ত্র?
ওরা কি জেনে গেল আধুনিক যুগের পুরাতন পূজার কথা?
যেখানে রক্তপাত জাগায় ভীত ভ্রম সমাজ,
যেখানে বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ উপাদান হিংস্রতা?
যেখানে ওদের বানানো ফর্মুলা তে হয়েছে মৃত্যুর অভিক্ষেপ,
যেখানে কালো ধোঁয়া হয়েছে নিঃশ্বাসের নতুন সাধন।
ওরা কি জেনে গেল?

তবে কি হল?

ওদের কি শেষ হয়?

ওরা তো মনীষী নয়, তারকা ও নয়, ওরা তো মানুষ।
ওরা আবার আসবে, আবার জন্ম নেবে এই ধরনীতলে,
ওরা আবার দেখাবে মাতৃবক্ষে সদ্যোজাতের স্নিগ্ধ হাসি,
ওরা আবার শোনাতে ডালিম গাছে কুহুময় কোকিলের গান,
ওরা আবার জাগাবে নতুন আশা, শেখাবে নতুন করে
ভালোবাসা।

The Mango Tree

Rashmi Sanyal

I was sitting under a banyan tree. Or perhaps it was a mango tree. My memory fails me there. But, it was very peaceful. I felt relaxed in the shade and continued working on sweet and delicious mangoes, my favorite fruit. At a little distance, there were four kids playing - Shiva, Mohan, Jayanti and Shivani. They seemed really happy and carefree. It felt like the worldly tensions and stress had not hit them yet! There was a ball that they were tossing at each other. At first, it felt like along with the ball, they were sending each other their love, happiness, giggles and laughter as well!

I watched them play every single day at the same place and at the same time. Years went by! They grew up; they were no longer kids but adolescents. It felt like they had gotten into pairs, not just any pair but had turned into couples. It seemed like "Shiva and Jayanti" on one end and "Mohan and Shivani" on the other. Even though, they were couples, Mohan sometimes tend to give more attention to Jayanti. Who doesn't like attention! I was watching them, there was nothing more than pure love and friendly banter between the two but Shivani disapproved of that. I could still somehow see the ball that they used to play with. And now the same ball that held love and warmth for each other somehow changed its color. It turned purple and gradually as more and more time passed by, it turned black. The love had disappeared! The beautiful innocent relationship had been ruined with the feelings of hatred! The negative energy pushed them apart. I would still sit and wait for them under the tree at the same time, but I would never find all four of them together anymore. Either it was "Shiva and Jayanti" or "Mohan and Shivani" but never all of them together! I wouldn't even want to eat my favorite mangoes anymore! But what could I do? I thought I could bring Jayanti and Shivani to talk to each other, not to confront but to resolve the misunderstanding! But the negative energy was so deeply ingrained in both of them by now, that every effort was in vain! They both said stuff to each other that worsened the situation! As I watched it, I felt the mangoes had started to taste tarter and tasteless than ever before!

Months went by; I would still wait under the tree, rain or shine! Just to see if they got back together! But like any other wound, this wound also took its own sweet time to heal! I know Shiva and Jayanti really missed Mohan and Shivani. But Shivani had kept the ball of hatred with her! One fine day, when I was least expecting, I saw Shivani talking to Jayanti! I couldn't seem happier. And even the mangoes started to taste sweeter again! Seemed like the ball was getting lighter again and the darkness was fading! But, I noticed the change! Now Shivani would talk to Jayanti but there was no friendly banter or even any exchange of word between Jayanti and Mohan! It felt like the ball of hatred had not changed color, it had only changed hands, earlier it was with Shivani and now it happened to be with Mohan! I could never understand why Jayanti had to bear the brunt of the "ball of hatred? Why was her friendliness unaccepted? But, I was happy with the changing season, the taste of mangoes and friendly reunion! But there was still something missing....



HINDUISM 106---THOUGHTS ON PRAYER & MEDITATION

Mita Mukherjee

In this article I would like to present some ideas on harnessing the thoughts through meditation and prayer.

MEDITATION: this word is derived from the Latin word, “meditari” meaning “to engage in contemplation or reflection. By the same token, the Webster dictionary mentions the word, “mete”, meaning boundary; another word very similar is “mederi” which means to “remedy or heal”, also the Greek word medesthai, means “to be mindful of”.

In other words, we can put all these definitions together and say that “MEDITATION “is a process of mindfully engaging in contemplation where there are no boundaries to where the mind can travel, (be able to transcend the world) and this will result in healing of the mind and body as a whole.

The basic nature of Human beings is to achieve wholeness, or realize the “self” within, it can be called, “atma” in Hinduism, “Bodhisatwa-or Buddha nature by Buddhists, Tao or spirit consciousness—or realization of “god” within us.

It is said that only through meditation, or by quieting the mind and then focusing the mind can this awareness be developed. The ultimate goal is an awareness that supersedes all thoughts and one realizes that he or she is part of this great universe and there are no boundaries, there is no separation—everybody and everything in this planet and space is part of a whole and there is no me or mine; I have read about enlightened people like, Ramana Maharshi, Rama Krishna, Eckhart Tolle, and countless others describe this as an earth shattering realization, that they suddenly had—and their whole perspective changed in an instant!

However we, with our egocentric senses hold on to our personalities, our material objects for dear life, because we identify with the world of objects, people and things. Question comes to mind—we ARE separate,-- we have different names, personalities, we are of different creed and color—how can we all be the same?

Vedanta explains with the example---there can be numerous kinds of pots but they are all made of clay—when the pot dissolves, only clay is left, similarly, there can be all kinds of gold ornaments, but the gold is inherent, without the gold there can be no necklace, or bracelet and when the ornaments are melted only gold remains; similarly the essence of all life is the same, call it supreme consciousness, atma, God –energy—whatever name—but this enlivening factor in all of us keeps us alive, without it, we are just a physical body. Ultimate goal of meditation is possibly to realize this great “TRUTH”.

However, daily meditation practices can enhance awareness, mindfulness, focus, intuition and insight.

It is best to find a quiet corner without distractions, wear comfortable clothing, and sit with the back straight, can be in a chair or on the floor and begin one’s practice; Focusing on the breath in—and out—is a good way to begin; the mind will be distracted, it is the nature of the mind, when one is aware that it has resumed it’s chatter, just acknowledge and let it go, no need to feel guilty, there will be a few quiet moments, before one realizes that the mind has probably gone to the “to-do” list or towards thoughts of food , clothes etc, bring the mind back and start again. Slowly but surely the mind does quieten down;

Chanting a mantra, or chanting “om” also is helpful. After practicing for a while, silly things don’t matter anymore, one starts to see the big picture, a positive attitude --- and most of the time that can be the outcome.

PRAYER: The essence of prayer does not consist in asking God for something, but in opening our hearts to God, speaking with him and living with him in perpetual communion. (Sadhu Sundar Singh)

As children we are taught to pray, and to participate in puja (worship) God ; I was led to believe that if I ask God for something I will get it, As I grew up I realized that prayer was more of a conversation with God or Bhagwan as I called the supreme being at that time. “Please Bhagwan, let me pass my exams this time, I will study harder next time, I remember making all kinds of deals with God;

However with maturity I realized that prayer is the ultimate way of union with the divine presence within us.

Prayer comes instinctively to all people, from a child to a grown man; When a situation arises where we feel helpless we turn to prayer, we feel comforted; Scientific studies have shown that humans are “wired for God” so we can pray as naturally as we breathe!

Swami Chinmayananda says, “prayer is often misunderstood and misused; we consider God an almighty being remaining somewhere above the clouds, like a tyrant punishing us for our misdeeds, and rewarding us for our good deeds just to express His omnipotence, on the other hand He is described as a kind and loving presence—no wonder we are confused. Thus to many of us prayer has been reduced to begging in abject despair and fear, this is false prayer.

Prayer is not begging, it is an invocation, where we learn to rise above our lower selves and invoke noble and divine impulses present in all of us. Man is essentially divine—he is God in action but veiled by his ignorance of his true divine nature.

To unveil this essence in ourselves by discarding all false matter envelopments, to reject our identifications with our body-mind-intellect—to invoke the pure awareness that shines within us is the highest peak of prayer and the fabulous summit of meditation.

In conclusion, prayer and meditation are practices that invoke our true selves to be unveiled, and at some point we will strive to reach the highest goal in life, that is “Moksha” or union with God.



Art by **Medha Pan – 7 years**

What is the best thing about your life?

Rashmi Sanyal

The other day I and Ronit were driving in the car and I asked, “Ronit, what do you think is the best part about your life”? He of course ignored me as usual. I threatened, “If I don’t get the answer, don’t expect any bubble gum from me” and then he finally said, “What did you ask”? I repeated the question, “Ronit, what is the best thing you like about your life”? He said, “Why do you ask”? I answered, “Just generally”! He said, “Will I get a bubble gum, if I answer you”? I said, “of course”! He answered, “**I get to watch movies, I get to play with my baby brother and I have all the first four of Harry Potter books**”! I kept probing about his best part of life at 6! I coaxed some more! And he oozed out some more cool parts of his life, “**I had a great birthday at Family sports**”, “**My plants that I planted are sprouting**”, “**You bought me bubble gums**”.

I sat there driving and thinking how simple and innocent things make Ronit’s life so beautiful! I looked out at the clear azure sky. I started to question myself, “What is the best part of my life”? I looked around and there were trees along both sides of the road. But, the leaves had fallen down and the branches were bare and dry. I thought to myself, I am glad that I am not a dry tree! I was in DC couple of weeks ago and it was extremely cold and snowy! I saw a guy sleeping outside on a road in a sleeping bag, where it was hard to stay out even for few minutes at night! Even though I was clad in warm clothes, I felt really cold but blessed!

I am glad that I can breathe! Getting pneumonia last Winter was for sure not the finest part of my life either! Feeling of breathlessness sucks! But the two beautiful gems, my kids that for sure make my life more than beautiful! I can’t imagine my life without them! Those for sure are the highlight of my life! The best part of my life! How about you? What is the best part of your life?



Art by *Rajarshi Bose*



Shohini Ghosh,
GRI, Realtor



RESIDENTIAL BROKERAGE

Shohini.ghosh@coloradohomes.com

www.coloradohomes.com/shohini.ghosh

Cell #720-217-8516

Fax#303-740-8328

Homes are my business
thinking of Buying/Selling your
home

Call me today
@720-217-8516

*

Cash in on this great Seller's market

তিনটি ছুট অধ্যায়

রমা সাহা

প্রতিদিন জীবনের সামনে হাতছানি,
অর্থ, সুরা আরও কত কি!
কোন দিকে যাই, কার কাছে চাই মুক্তি কে দেবে সঠিক
পথের মন্ত্র চিত্র
পেয়ে যাই ছন্দ, সুর পেয়ে যাই
আলো ময় শব্দের ব্যঞ্জনা
জীবন মেলে ধরে মস্ত বড়ো
এক কবিতার মত
তবু আকাশ, বাতাস, নদীর কাছে চাই না কবিতা।
চাই না রাতের লজ্জাবনত চোখে
খুজতে থাকি চতু জীবন।

সারা জীবন ধরে যদি সবই ভুল করে থাকি
সে ভুল আমারই সঞ্চয় হয় থাক
কোনো অনুতাপ, অভিযোগ
কারোর বিরুদ্ধে নেই
নেই এক ফোটাও চোখে ভাঙ্গা জল
সব দুঃখ কাউকে বলা যায় না স্তব্ধ হয় থাকি
অন্ধকারের মতো নির্বাকব দুঃখের সঞ্চয় বুকে বেঁধে
নির্ঘুম জেগে থাকি যন্ত্রনার কাঁটায়
একদিন সব সঞ্চয় ছড়িয়ে দেব নির্জনে
রাস্তার ধুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে সব
পাখি তার ঠোঁটে গেথে নেবে।

কল্পনার লতা জড়িয়ে সপ্ন বাগানে
নীরবতা ঘুরে বেড়ায়,
ওদের গোপন কথা বুঝতে চেষ্টা করে,
ওদেরই ভাষায়, পাতায়, পাতায়
শিরায়, শিকড়ে, একাক্ষ হয়ে,
শিল্পী পাখির মতো
শিল্প খোঁজে
হৃদয় দিয়ে অবশেষনী চোখে,
একান্ত আপন ভেবে যাকে নিয়ে ঘর বাঁধে
ছট একটা আঘাতে
প্রতিবিশ্ব ভাঙ্গে
লম্বভম্ব হয় যায় সেই মুহুর্তে
ভাঙ্গা মুকুরে নিজেকে দেখে
সেও হয় টুকরো টুকরো।
নীরবতা বলে থাকে আহত বাঘিনীর মতো।

KRISHNA GROCERIES

Niki Khatri
Vinay Shah

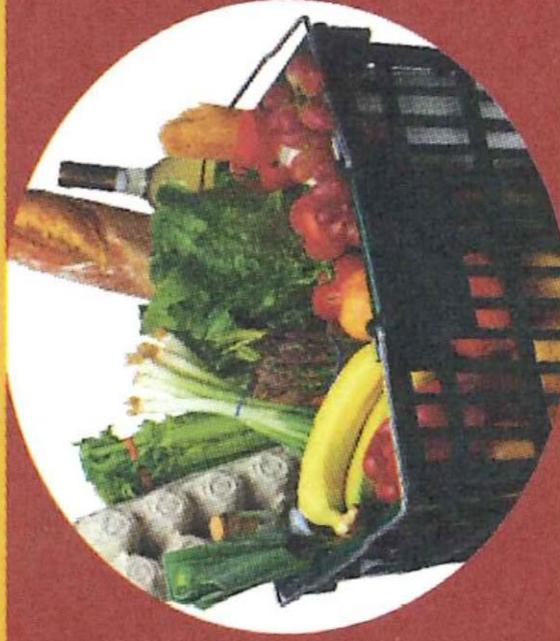
400 W South Boulder Rd, #2800

Lafayette, CO-80026

303-665-8399 (Ph/fax)

303-641-7974 (cell)

<http://www.krishnagrocerys.com>



Business Hours: Tuesday to Sunday 11:00 AM - 8:00 PM

ভাসান

অমিত নাগ

চলে তো যেতেই হবে একদিন, সবারই মতো
তা বলে দুঃখ বিলাস, সে আমার পোষাবে না ধাতে
স্মৃতিগুলো তাই আজ কুচি কুচি করে ভাসিয়ে দিলাম
কাল বৈশাখী ঝড়ের বাতাসে।
শব্দ, সংগীত, ছবি, গন্ধবাহী স্মৃতির দল
এক ঝাঁক মাছের মত যদিও বেশ চলছিলো প্রথম প্রথম
দলবদ্ধ ভাবে, হঠাৎ দমকা ভেজা বাতাসের আঘাতে
দলছুট হতেই হল এক সময়।
আর ঠিক তখনই বেমক্কা পাওয়া মুক্তির আনন্দে
টুকরোগুলো খুব এক চোট উড়তে উড়তে
উঁচু আকাশে, মেঘের আড়ালে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিচ্যুত হলেও
প্রকৃতির আমোঘ নিয়মে যা হয় আর কি, নেমে এল
এক এক করে মাটির বুকে।
শব্দেরা যেন সাদা পালক, ভেসে এলো গঙ্গার পাড়ে
রেলিঙের ওপর, ঠিক সেখানে যেখানটায় ভীরা স্বরে যুবক
আমি, অবনত মস্তকে প্রথম বলেছিলাম ভালোবাসি,
যার উত্তরে তোমার অস্ফুট প্রতিশব্দ চয়ন
“জানি,” আজো মনে পড়ে।
গান আর গন্ধরা বরাবরই একটু লাজুক তাই
সবার সংগে উড়ে যাবে ভেবে, ওদের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে

জোরসে ওড়াউড়ি শুরু করেও দূরে আর যেতে পারলো কই
যুরে ফিরে মাথার ভিতরে তোমার চুলের গন্ধ, আর পাওয়া গান
আজো তাই গুনগুন করে মরে।
শেষ দেখা সেদিনের ছবিটাই শুধু যা অভিমাত্রী রয়ে গেল
আজও
আজকেরই মত বর্ষা ভেজা আরেক সন্ধ্যায়, হাজার হাজার মোড়ে
বাস স্ট্যাণ্ডে, আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে
সব কথা ভুলে যেতে বলে, পিছন ফিরে তোমার চলে যাওয়া ছবি
উঁকি দিলেও সামনে আসে না আর।
তখনো বেকার আমি তোমাকে নিজের বলে দাবি করার
যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি, তাই শুভানুধ্যায়ী কিছু গুরুজন
বিয়ে ঠিক করেছিল অন্য সুযোগ্য পাত্রে
আমাদের ভালবাসার মত চপল ঘটনাকে
মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে।
এতদিন পরে সেসব কথার কি আর মানে থাকতে পারে
স্মৃতিগুলো আজ তাই উড়িয়ে দিয়েছি কালবোশেখি ঝড়ে
অথচ আমাকে অবাক করে বেশ খানিক ওড়াউড়ি শেষে
বেয়াড়া স্মৃতির একে একে সেই ফের নেমে এল দেখো
আমারই হাতের নাগালে।



Sunset by Shreeshha Halder – 8 years



Victoria Memorial by Krishnendu Das

অপেক্ষমান
দূর্বা দাশ

কিসের অপেক্ষা তুমি জানো না, তবু
একলা ল্যাম্প পোস্টের সাথে সন্কেবেলায়
তোমার অনাবিল সখ্যতা-
রাত আর দিনের ধারাবাহিকতায়
পুরানো হয় তারাদের লুকোচুরি খেলা;
কিসের অপেক্ষা তুমি জানো না, তবু
বেঁচে আছ স্বীকার করতে,
দ্বিধায় থাকো আনৃত্য।

স্বর্গের সিঁড়ি
রথীন বসু

সবাই তো চায় স্বর্গে যেতে, পাপ পুণ্যের ধার ধারে?
কিন্তু যখন তারিখ টা চাও, তখন বসে ঘাড় নাড়ে।
স্বর্গে যাবো স্বর্গে যাবো সবাই মোরা তাইতো চাই,
কিন্তু এতো ব্যাস্ত কিসের? একটু সময় দাওনা ভাই
যাকনা কদিন, সবুর করো, কটা বছর কাটতে দাও
তেমন কিছু নেইতো তাড়া, ঘোড়ায় কেন জিন লাগাও?
যাবার সময় আসলে পরে, যাব আমি ঠিক চলে
কিন্তু কেন দিচ্ছ খোঁচা? গুঁতোও কেন তাই বলে?

A SILENT NIGHT—in Luanda

Mita Mukherjee

Stark darkness and absolute silence woke me up with a start!

“Where am I?” was the first thought that hit me. It took me a moment to realize that I was in a big mansion, alone, in a foreign country, in Luanda, Angola in South Africa;

This was the first time, I was alone in the house at night, my husband had gone on a business trip for a couple of days; There was no telephone in the house, we were given walkie-talkies and if we needed something, we were supposed to press the button and call for the “segura-guarda”—the security guards. The house or mini mansion as I called it --was quite large for two people; It was 2 stories high, a large kitchen, 2 living areas on the ground floor; 4 bedrooms and an attic room on the top. Just closing and locking all the doors and windows was a chore at night; consequently we just used 2 rooms, upstairs—our bedroom and the puja room (worship area).

The language was Portuguese; my vocabulary included 2 words—“bon-dia” good morning/day and “bo-noitche” good night! By the end of our stay I had mastered enough Portuguese to get my point across, but at that time I was pretty ignorant;

As I lay there, I tried to figure out what had woken me up. The generator!

This was the year, 1998; Angola was a war-torn nation; There was a constant fight between the government officials and the rebel leader Savimbi; We as ex-patriots (foreigners from the US) were given nice houses, with one guard who was there all day and a night guard who was there at night.

Just like my hometown of Kolkata, in Luanda, electricity like a guest artist would come and go fleetingly, so at night the whirring of the generator was a welcome sound. This was November, which was summer in Luanda, and without the air-conditioning, the air became stifling hot. At night when the electricity went out the night guard usually turned the generator on.

I sat up getting ready to yell at the guard to start the generator ; it had happened a couple of times before, when the guard had fallen asleep near the gate and I had seen my husband yell from the veranda and the guard usually ran to start the generator which was at the back of the house. I was trying to remember the night guard’s name---“what was it? Paolo? No that is the name of the day guard,” at this point I had swung the veranda door open, patchy moonlight greeted me; some instinct made me freeze!

The gate was wide open! It was supposed to be locked at night! I peeped over the banister. Three men had the night guard, Ricardo—(yes that was his name!-)—surrounded; they were talking to him in harsh whispers, of course I couldn’t understand a word they were saying, but it didn’t bode well, the hair at the back of my neck stood up as unnatural fear gripped me. This seemed like an attack, maybe they were bandits, but how did they get in? I heard a soft thud—it seemed like one of them had punched Ricardo, and he lay on the floor writhing with pain, while the men seemed to be arguing among themselves.

My mind screamed for me to take action! I seemed to be rooted to the spot!

All of a sudden I seemed to come alive.

Some instinct made me grab the walkie- talkie and my purse, which I always kept by my bedside and I ran to the far bathroom; There were two bathrooms on this floor one had a shower and the other one had a bathtub; Some instinct made me grab the black shawl that I always slept with;

I tip-toed into the bathroom and closed and locked the door. I got into the bathtub, pulled the curtain and covered myself with shawl, hoping that they wouldn’t be able to discern me in the inky darkness;

I tried frantically to press the button on the walkie talkie, whispering “sugura-guarda—danger—danger!” Too late I realized I should have at least learned the Portuguese word for danger or “S.O.S”

All I could hear was crackling or static in the air;

My heart was beating so loudly, I was panting—what would happen to me? I was alone—totally alone in this country, I didn’t even know the language, I couldn’t even plead with them and say “take everything! Spare my life”—there was not much to take anyway, all my valuables were back in the USA— \$500 in bills was in my purse; I wanted to see my children again, I wanted to see my mother, sister---husband!

Suddenly I heard footsteps, whispers, rattling of doors; we usually kept the doors of the rooms closed;

I had heard stories of robberies, where the maids would let the bandits in and they looted everything but didn't harm anyone; I hoped this was the case; I sat with bated breath, footsteps sounded right outside my door— I started chanting all the mantras that came to my mind—every minute expecting the door to the bathroom to burst open! —after a long terrifying moment, the noises receded a bit; Again I punched the button and whispered, “sugura-guarda—robbers-attacking I am in danger—danger-please help ! HELP!”

A perfectly clear voice came across—“yes madam—you say robbers?-what is the address?”

What is my address? My mind went blank! “Mukherjee—Mita Mukherjee –address—I can't”

“Mukherjee—Hemanta?” he asked.

“yes! YES!” “Ok, we will send guards right away—are you in danger?—stay where you are—don't panic—ok—don't worry. They will there as soon as possible” The voice clicked off;

I sighed with relief, my body sagged—but I was not out of the woods yet, I cautiously got out of the bathtub and opened the door a tad.

Tiptoeing to the stairs, I peered through the banisters; I heard clinking of bottles, and glasses and laughter; the electricity still hadn't come on. Pale candle light cast dark shadows on their rough figures and made grotesque shadows on the walls.

They seemed to be having a good time—we had inherited a cache of alcoholic beverages from our predecessors, so the robbers seemed to be demolishing the whiskey and rum etc etc—reminded me of the book, Treasure island;

Suddenly the door burst open and about five police men walked in with their guns drawn—a shout went up and the robbers tried to use Ricardo as a shield and tried to back out—however the policemen were shouting orders and all of a sudden Ricardo jumped up and kicked his captor in the head—whirled around and kicked another guy—by then the police had them cornered—it was like watching a movie—I heaved a sigh of relief and went back to my puja room, thanking the Gods for saving me from such a chilling encounter!

The main police man came to check on me—“madame are you ok?”

“Yes Yes—thank you thank you!” I said gratefully.

Rest of my stay in Luanda was uneventful—I really enjoyed it there, made a lot of friends; added to my life experiences!

কলকাতা যাওয়ার আগে

অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেস্কটপের ওয়ালপেপারে ডাকছে কলকাতা,
 অফিসে বসে মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা।
 সাত দিন পরে দেখব তাদের, হবে অনেক আড্ডা,
 কাজের মধ্যে ভাবতে গিয়ে কাজ হয় বেপাত্তা।
 পথ চেয়ে আছে কত বন্ধু, দুই বছর ধরে,
 ফোন করলেই প্রশ্ন করে "কবে আসবি ফিরে"।
 জেঠুর কাছে প্রশ্ন ছিল, "ডিউটি-ফ্রি তে কি চাই",
 হেসে বলল "থাকিস এক মাস, এইটাই শুধু চাই"।

কতদিন পর পাবো আবার মা-বাবার স্নেহ,
 ভাবতে গিয়ে আনন্দে মাতলো আমার দেহ।
 মোঘলাই আর রোল আর ফুচকা আর মোমো,
 নতুন খাবার জায়গা সবে লিস্ট বানিয়ে নেবো।
 হাংছানি দিয়ে ডাকে আজ গ্রামের বাড়ির উঠোন,
 দেখলে চিনতে পারবে কি, পাশের বাড়ির ছোটন।
 ভাবছি যখন ছোটদের সাথে খেলব কানামাছি,
 ফোন বাজলো, দেখলাম আমি কলোরাডো-তেই আছি।

বেড়া

মোহাম্মদ ইরফান (mirfan@du.edu)

১

"তোক কইছি লালীর ন্যাঙ্গে ন্যাঙ্গে থাকপি। তুই ওক পানিত নামালি কেন হারামজাদী। আমি এখন কেফা করি? এত টাকা দিয়া কিনলু? ওর দুধ বেচি আমরা খাই, কিনার টাকা শোধ দিই। এহন আমি কি করি? "

করিমের চিংকারে ছুটে আসে নসিমন। মেয়ে করিমনের চুলের মুঠি ধরা করিমের হাতে। একনাগাড়ে বকাবকি করে যাচ্ছে করিম। করিমনের পাংশু মুখ দেখে মায়া হয় নসিমনের। ধরলার বন্যায় ডুবে, ডায়রিয়ায় ভুগে পরপর দুছেলের মৃত্যুর পর কোল আলো করে আসা এই মেয়ে। বাবা-মায়ের নাম মিলিয়ে নাম রেখেছে করিমন। গাঁয়ের অন্য মেয়েদের তুলনায় কিছুটা বেশী আদর-যত্ন পেয়েই বড় হয়েছে করিমন। কিশোরী কন্যার আবদার মেটাতে আগ্রাণ চেষ্টা করে বাবা-মা দুজনেই; যদিও সাধ আর সাধ্যের মিলন ঘটে কদাচিত্।

কি এমন ঘটল যে এত আদরের মেয়েকে এভাবে বকাবকি করতে হচ্ছে? বোঝার কোন চেষ্টা না করেই মেয়ের পক্ষ নেয় মা, "দুইদিন পর সাঙ্গা হবি, এত বড় চ্যাংরি গাওত কেউ হাত দেয়? ছাড়েন অরে।"

"কি করনু মোর ছাওয়াল?" মেয়েকে বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় নসিমন।

"কি করনু? তোর আদরের মাইয়া লালীক বর্ডার পার করি দিছে?" হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দেয় করিম।

ঘটনার সূত্রপাত সেদিন দুপুর নাগাদ। গ্রামের প্রান্তে নিজেদের গাভী লালীকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল নসিমন।

২

বছর দেড়েক আগে মাসিক গোহাটা থেকে হাজার দশেক টাকা দিয়ে এই দুগ্ধবতী গাভীটি কিনেছিল করিম। টাকাটা অবশ্য নসিমনের, ধার হিসেবে পেয়েছে ঋণ বিতরণ অফিস থেকে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ দেয়ার শর্তে। ঋণের লায়েক হতে দুমাস ধরে নিয়ম করে পাপিয়া লিডারের ঘরে হাজিরা দিয়েছে নসিমন। নানান রকম জ্ঞানের কথা শুনেছে, সই দিতে শিখেছে। নসিমনের এত কষ্টের কামাই এক কথায় দখল করে নিতে চেয়েছিল করিম, 'তুই ঘরত থাকি টাকা শোধ দিবি কি করিয়া?' পাপিয়ার কঠিন নজরদারিতে কিছুটা

পেছায় করিম, শেষমেশ রাজী হয় গরু মোটা তাজা করণের যৌথ পারিবারিক প্রকল্পে।

পাপিয়াই খোঁজ দিয়েছিল গোহাটার। মাসের প্রথম জুমাবার বড় হাটা। দূর-দুরান্ত থেকে গো-মহিষাদি নিয়ে হাজির হয় বেপারীরা। ওপার থেকেও আসে সতেজ বলদ আর সরস গাই, কাঁটাতার পেরিয়ে, কানুন মাড়িয়ে। ভারত-মাতার নিষেধাজ্ঞা লক্ষীর মুখ দেখে ভুলে যায় ওপারের রক্ষী। এপারের লোকপালিত প্রহরীও বশ হয় গৃহপালিত চতুষ্পদীর মতই। তবে ঘাসে নয়, ঘুমে।

পাপিয়ার টেন্ডেলকে নিয়ে আসায় খুব সহজেই একটি দুধেল গাই কিনে ফেলে করিম। দাম-দস্তুর করতে গিয়ে ব্যাপারীদের হাতে অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ায় খুশিই হয় করিম। টেন্ডেল মন্ডলের সাথে ব্যাপারীর আদান প্রদান নিয়ে মাথা ঘামায়না মোটেও। দুদিনের বাছুর ছেড়ে আসতে গাভীটির মনের কি অবস্থা হয়েছিল বোঝার কোন উপায় ছিল না করিমের। তবে কিনে আনার পর থেকে তার আর তার মেয়ে-বোয়ের গভীর যত্ন-আত্তিতে গাভীর কষ্ট কিছুটা হলেও ঘুচেছে। লালচে-খয়েরী রঙের গাভীকে করিমন আদর করে ডাকে লালী।

প্রতিদানে লালীও অনেক দিয়েছে, অর্থে-স্বাস্থ্যে-অবস্থায়। লালীর দুধে পুষ্ট হয়েছে করিমনের বাড়ন্ত শরীর, লালীর দুধের সরের আভা যেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে উচ্ছল কিশোরীর মুখে গায়ে। দুধ সমবায়ের গাড়ীওয়ালার কাছে দুধ বিক্রি করে যা পায় তাতে নসিমনের ঋণ শোধ করেও কিছুটা থেকে যায় হাতে। করিমের দিন-মজুরি আর নসিমনের কচুশাক কুড়ানিতে দু-একদিন ছেদ পড়লেও চিন্তা করতে হয় না আজকাল আর। লালীর গোবর শুকিয়ে চুলো জ্বালায় নসিমন, কুড়োনো শাকের বোঝা এখন আরো ভারী করতে হয় না শুকনো পাতা আর ডালে।

লালীকে মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়ে ঘাস খাওয়ানোর দায়িত্বটা নিজে যেচেই নিয়েছে করিমন। গরু চরানোর ছলে হাটে-মাঠে বেড়ানোর সহজ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে কোন কিশোরী? নসিমনও মেনে নিয়েছে আছুরে মেয়ের আবদার, স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে জাবনা মাখানো, গোসল দেয়া, গোবর সাফ আর শুকানোর মত কঠিন কাজগুলো। গরীবী শরীরের ছিরি-ছাঁদ কেড়ে নিলেও মায়ের মনের মাধুর্যে টান পড়ে নি এতটুকু।

করিমনদের গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে নদী। ওপারের জলঢাকা এপাশে এসে হয়েছে ধরলা। নদীর দুধার থেকেই উঠে গেছে বেড়া। কাঁটা দেয়া মোটা মোটা তার দিয়ে তৈরী বেড়া দুই নদীকে পৃথক করতে না পারলেও পৃথক করেছে দুই দেশকে, দুই দেশের মানুষকে। কখনো কখনো বেড়ার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যায় রক্ষীর দল। রক্ষীদলের অকারণ হাঁক অমূলক ভীতির সঞ্চার করে দুপারের লোকজনের মনে। মনের আরো গভীরে প্রথিত হয় সীমানা পিলার।

গ্রামের শেষমাথা আর কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানে একখন্ড সবুজ মাঠ। ধরলা পারের বালি এখনো ছুঁয়ে উঠতে পারেনি সবুজটুকুকে। গ্রামের সীমানার বাইরে হওয়ায় এদিকে গ্রামবাসীরও খুব একটা আসা হয় না। পাথারের সবুজ ঘাস তাই উজাড় হয় না সহজে।

এই নিরিবিলি সবুজ খুবই পছন্দ করিমন আর লালীর। লালীর পছন্দ সবুজ ঘন ঘাস। মুট মুট শব্দে লালীর ঘাস ছেড়া দেখে আর গুনগুনিয়ে গান ধরে করিমন। এক কামরার ঘরে বাবা-মা-মেয়ে। মেঘে-মাঘে লালীও। নিজের একটু জায়গা কোথাও কেউ দেয় নি, দিতে পারে নি করিমনকে। পাথারের সবুজ নির্জনতায় বালিকা খুঁজে পায় তার নিজের জগত। ঘুরে-ফিরে, লালীকে খুঁটায় বেঁধে এক দৌড়ে নদী ছুঁয়ে দিয়ে আসে। কখনোবা কথা কয় নিজের সাথে, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অবোধ প্রাণীর দিকেঃ "আমাক কেমন লাগতেছে রে লালী? ক দেখি, জীবন দাদা আইজ আমাক দেখি কি কবে?"

এই জীবন দাদাটি করিমনের জীবনে নূতন সংযোজন। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে এদিকের মতই এক টুকরো জমি। সাদা রঙের একটা বলদকে ওই জমিতে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসে ধুম কালো এক কিশোর। করিমনের মতই প্রতিদিন দুপুরে। দূর থেকে বলদ আর তার রাখালকে দেখে অনেকই কৌতূহল জেগেছে করিমনের মনে। ইচ্ছে হয়েছে আরেকটু কাছে বেড়ার পাশে গিয়ে আরো ভালো করে দেখে দুটো কথা বলে ওপারের ওই অচিন বালকের সাথে, খোঁজ নেয় তাদের গাঁয়ের, তার বাবা-মার, একটু ছুঁয়ে দেখে ওর ধবধবে সাদা গরুটি। সাহস করেনি মেয়ে। মনে পড়ে গেছে মায়ের সাবধানবাণী, "অচুকা ঘাটা দিয়া যাইস না। অচুদি চ্যাংরার দিকে চাইস না।" সংকোচে, সংস্কারে, সভয়ে সরে এসেছে বেড়ার কাছ থেকে আরো দূরে।

দূরতুটা ঘুচিয়ে দিল একদিন লালীই। লালীকে ঘাস খেতে দিয়ে একা একা একাদোক্কা খেলছিল করিমন। করিমনের

অমনোযোগিতার সুযোগে খুঁটা ছিড়ে বেড়ার দিকে চলে যায় লালী। করিমনের মতই তারও যেন আকর্ষণ অজানার প্রতি।

ওপারের সাদা ষাঁড়ের ভঁঅঅ আওয়াজে টের পায় করিমন। দৌড়ে গিয়ে দেখে তার আদরের লাল গাই কাঁটাওয়াল বেড়ায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বোঁজা লালীর, লেজ নড়ছে। বেড়ার ওপার থেকে লম্বা জিহবা বের করে লালীর গতর আঙুলে আঙুলে চেটে দিচ্ছে ওপারের শ্বেত শুভ্র বলদ।

"হুইশ শালা" লালীকে দেখে ওদিক থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে আসে বলদের মালিক, হাতে থাকা ডালের বাড়ি সপাসপ বসিয়ে দেয় বলদের গায়ে।

এই প্রথম তাকে কাছ থেকে দেখা করিমনের। কালো গায়ের রঙ কাছে থেকে আরো অনেক কালো লাগে, তবে দূরের ধোঁয়াটে কালো কাছে আসায় কিছুটা চকচকে। পরনের কাপড় করিমনের পোশাকের মতই মলিন। শুকনো রোগা মুখের সামনে বেরিয়ে আছে একসারি উঁচু দাঁত, অনেকটা পুরনো গাড়ি আগলে থাকা পোক্ত মার্ডগার্ডের মত। আর এই সবকিছুর সাথে কিছুটা যেন বেমানান পরিপাটি করে আচড়ানো চপচপে করে তেল দেয়া একমাথা কালো চুল।

বালকের বিব্রত বদন কিঞ্চিৎ সাহসী করে তোলে করিমনকে। মৃদু গলায় বলে ওঠে সে, "গুরুটাক ওস্কা করি মারিয়েন না।"

বালিকার উদারতায় আড় ভাঙ্গে বালকেরও। সচেষ্ট হয় বালকত্ব জাহির করার এই অনায়াসলব্ধ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে। "ওই ধবলা, বেড়া তুই জেবন পরামানিকের বলদ হবার যুগি়া না।" মার্ডগার্ড যতদূর সম্ভব লুকিয়ে বুক চিতিয়ে গলা উঁচিয়ে বলে ওঠে সে। গলার আওয়াজেই যেন বুঝিয়ে দিতে চায় একটা বলদ চরিয়ে বেড়ানো কেবল তার মত একটা জোয়ান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

ফিক করে হেসে দেয় করিমন। অপ্রস্তুত হয় বালক। বুঝে উঠতে পারে না হাঁসির পাত্রটি কি পরামানিকের পো না তার পরাণ প্রিয় গো? রেগে গিয়ে এক ঝটকায় ধবলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই ফকফকা হয়ে যায় ফিচলেমির ফিকির।

সঙ্গিনীর স্পর্শে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে ধবলার অঙ্গ। মানবের মত কাম গোপনের উপায় কিংবা ইচ্ছে কোনটিই বুঝি নেই প্রাণীর। হালকা গোলাপী রঙের পূর্ণোখিত পুরুষাঙ্গ (কিংবা বলদাঙ্গ) কাম নয় কৌতুকের উদ্রেক করে বালিকার কৌতূহলি মনে।

পরামানিকের লুকোনো মার্ডগার্ডও বেরিয়ে আসে। আবারো ঘুরে তাকায় সে বালিকার দিকে। ভরদুপুরে নির্জন পাথারে অচেনা মানুষের চোখে চোখ, নিমেষেই শান্ত করে বালককে।

"তোমার বাড়ি কই?", গলার স্বর ধরলার পলি কাদার চেয়েও নরম আর থকথকে করে ভাব জন্মতে সচেষ্ট হয় সে।

"হুই গেরামত," বলেই দড়ির হ্যাঁচকা টানে লালীকে নিজের কাছে নিয়ে আসে করিমন। "চল শালী," বলে হনহন করে ফিরে যায় গ্রামের দিকে, নিজের সীমানার ভেতরে। কিছুটা হতোদ্যম হয়ে বেড়ার কাছ থেকে ফিরে আসে জীবনও। দুজনের কেউই খুব একটা মনোযোগ দেয় না তাদের প্রিয় শালা-শালীর বিরহী চিৎকারে।

সেদিনের পরে আলাপে-পরিচয়ে আন্তে আন্তে আরো কাছাকাছি আসে জীবন আর করিমন। করিমন জানে জীবনের বাবা পরিমল পরামানিকের চুল কাটার দোকানের কথা, যেখানে গ্রামের ছোট বড় সকলেরই নিত্য যাওয়া আসা। লালীর দুধ দুইয়ে প্রায়ী ওপারে পার করে করিমন। দুধ পারাপারের সময়ে কাঁটাতারের বেড়ার শীতল ধাতব স্পর্শের চেয়েও জীবনের ঘামে ভেজা ধুলোয় ভরা আংগুলের ছোঁয়া অনেক অনেক মধুর মনে হয় করিমনের।

৪

আজ দুপুর নাগাদ বেড়ার পাশে গল্প করছিল জীবন আর করিমন। লালীর দড়ি খুলে দিয়েছিল করিমন। নির্জন দুপুরে নিষিদ্ধ স্বাধীনতা ভোগের গুনাহ প্রিয় সাথীর সাথে কিছুটা ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছে সে। কৃতজ্ঞ কামার্দ্র লালী লজ্জিত ধীর পায়ে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই জীবনের দিকে মন দেয় করিমন। এরই মধ্যে ধবলা আর লালী গুটিগুটি পায়ে কখন এগিয়ে গেছে নদীর দিকে দেখেনি দুজনের কেউই। হঠাৎ হাষায় দুজোড়া চোখ চকিতে বিযুক্ত হয়ে ঘুরে যায় একই দিকে। নদীর পাড়ে বেড়ার যেখানে শেষ ঠিক সেইখানটায় ধবলার আরো কাছে যেতে গিয়ে বেড়ার কাঁটায় আটকে গেছে লালী। সীমানা-বেড়া ঠেকাতে পারে না প্রাণীর চালান, ঠিকই আটকে দিয়েছে প্রাণের মিলন। লালীর আর্তচিৎকারে ব্যথিত হয় করিমন। উদ্বিগ্ন চোখে এদিক ওদিক তাকায় সাহায্যের জন্য। কেউ শুনতে পেলে সাঙ্গ হবে তার দ্বিপ্রাহরিক লীলা এই ভয়ও একই সাথে পেয়ে বসে তাকে।

লালীর বেদনায় লীলাভঙ্গের আশঙ্কায় বিহ্বল করিমনকে পেছনে ফেলে নদীর দিকে ছুট দেয় জীবন। লালীকে মুক্ত করে লালীর মনিবের চোখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের এই সুবর্ণ সুযোগ হারাতে চায় না সে।

এরই মধ্যে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে ধবলার কাছে পৌঁছে যায় লালী। ছড়ে যাওয়া চামড়ার ব্যথায় কাতর পশু

চোখ তুলেই ধবলার মনিবকে ছুটে আসতে দেখে। লুঙ্গি পরা লাঠি উঁচোনো জীবনের ধাবমান মূর্তি দেখে লালীর বুঝিবা করিমনের বাবার কথা মনে হয়। মারের ভয়ে দৌড় লাগায় লালী। সোজা জীবনদের গাঁয়ের দিকে।

এবারে হকচকিয়ে যায় জীবনও। কি হতে যাচ্ছে বুঝে নিয়ে লালীর গন্তব্যের দিকে বেশ খানিকদূর ছুটে গেলেও ওকে আর ধরতে পারে না জীবন। ক্লান্ত হতাশাগ্রস্ত জীবন বেড়ার কাছে ফিরে এসে দেখে একমনে জাবর কাটছে ধবলা। করিমনের দেখা নেই কোথাও।

৫

বাড়ি ফিরে বাবার কাছে বানিয়ে গল্প বলে করিমন, "আমি গাইক পানিত দিছি গা ধোবার লাগি। ও হাঁচর পারি ওপারত উইঠল। আমি কত ডাকনু। ও হাঁটি হাঁটি হুই গেরামত ঢুকি গেল।" পরিবারের অন্যতম উপার্জনের উৎস হাতছাড়া হওয়ায়, কেবল হাতছাড়া নয় একেবারে দেশছাড়া হওয়ায় শোকে-দুঃখে দিকপাশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে করিম। কি করে দেশান্তরী গাভীকে ফিরিয়ে আনা যায় তা ভাবার বদলে মেয়ের উপরে চড়াও হয়, আদরের শাহজাদী এক লহমায় হয়ে যায় হারামজাদী।

"ও এই টুকুন ছাওয়াল, ও কি করবি? ও কি লালীর পিছন পানিত নামি ওর ভাইয়ের মতন পেলাবনত মরবি?" ঘটনার বর্ণনা শুনে আবাবো মেয়ের পক্ষ নেয় করিমন। মনে পড়ে যায় বড় ছেলের মৃত্যুর পর কখনই পানিতে নামতে দেয়নি তার সন্তানদের। করিমনকেও পই পই করে বারণ করেছে লালীকে নিয়ে ধরলায় নামতে। করিমন তো এতটা সাহস করার কথা না। সন্দেহ জাগে মায়ের মনে। সন্দেহ প্রকাশে সাহস পায় না সে। আবাবো যদি মার খায় মেয়ে।

"মেয়েক মারি ফেলালি তো আর গরু ফেরত আসপি না, বাজারত গিয়া দেখেন মন্ডল কাকা কিছু করতি পারে কিনা? ওনার এসবগুলোক লোকজনের সাথে চেনাজানা আছে। কিন্তুক ওনার হাতে-ঠ্যাঙ্গে ধইরবেন, পাপিয়া মেডামরে যেন কিছু না হয়। লালী ভাগি গেছে টের পালে মেডাম আমাগোরে বানবার আবি।"

বউয়ের উপদেশ শুনতে ভালো না লাগলেও করার মত একটা কাজ পেয়ে তৎপর হয় করিম। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে রওয়ানা হয় বাজারের দিকে।

৬

বাজারে ঢোকান মুখে মোষ্ঠাকের চায়ের দোকানে পেয়ে যায় মন্ডলকে।

"হিতি আইসো।" করিমের আস্থানে কেরামের আসর ছেড়ে উঠতে রাজী হয় না মন্ডল।

"কিসের অতো ফইজদারী নাগচে?" খেঁকিয়ে ওঠে সে।

"বিবি পাঠাইছে।"

নসিমন পাঠিয়েছে শুনে কিছুটা নরম হয় মন্ডল। দোকান থেকে করিমকে বের করে নিয়ে আসে আসে একটু দূরে, করিমের গোপন সমস্যার জট খুলতে। মণ্ডলের ধারণা ছিল বরাবরের মত এবারো স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাটির কোন ঘটনা নিয়ে স্বামীকে তার কাছে পাঠিয়েছে নসিমন, আবারো সুযোগ এসেছে দিনের পর দিন ওদের ঘরে যাওয়ার, ওদের উঠতি বয়সের মেয়েটিকে চেয়ে চেয়ে দেখার। নসিমন আর করিম ওকে চোরাই গরুর কারবারীদের বন্ধু ভাবে ভাবে জেনে কিছুটা নিরাশ হয় মন্ডল। পরমুহূর্তে ভাবে, মন্দ কি? গরু পারাপার করে করিমের কাছ থেকে কিছু খসানো যাবে। এছাড়া এই সুযোগে হয়তো গরুর রাখালনী করিমের মেয়েটিকে ঘরের বারও করা যাবে।

মন্ডলের প্রথমেই মনে হয় ওপারে সমীর প্রধানের খোঁয়াড়ের কথা। সে অনেকটাই নিশ্চিৎ সীমানা পেরোলেও প্রধানের খোঁয়াড় এড়াতে পারে নি করিমনের গাভী। সমস্যা হচ্ছে এপারের মাল টের পেলেই অনেক বেশী মুক্তিপণ চাইবে প্রধানের পো। ওপারের টাকায় শোধ দিতে গেলে আরো বেড়ে যাবে খরচ। টাকা নিয়ে সমীর গাই ফেরত না দিলেও খুব একটা কিছু করার থাকবে না মন্ডলের। এই এক গাই নিয়ে সুবেদারের কাছে দরবার করতে গেলে খাজনার চেয়েও বাজনা বেশী হবে। সব মিলিয়ে বেশ জটিল একটা ব্যাপার।

এসব জটিলতা করিমকে বুঝতে দিতে চায় না মন্ডল। বেশ একটা জানি জানি ভাব নিয়ে তাকে শুধু বলে, "শোন বাহে, তোমার গাই খোয়া গেছে, তুমি দুখ পাইছ, একথা কয়া তো আর ওনাক গাই ফেরত দেয়ান যামো না।"

মন্ডলের কথার মানে পুরোটা না বুঝলেও মন্ডলের দেখাদেখি দূরের সীমানার দিকে তাকায় করিম। নিজের অজান্তেই মুখে ফুটিয়ে তুলে বিনয় আর সমীহের ভাব অদেখা ওনার উদ্দেশ্যে, "আমাক নিয়া চলেন, আমি কান্দি কান্দি মোর গাই চাইমো। ওনাক কব গাই না দিলে লোনের মেডাম মোক জেলত নিমো।"

"আনথাও হইও না, বাড়ীত গিয়া দেখ পাতি-উতি কি আছে, সব একজাগাত কর। যাও, যাও।" একইসাথে আশ্বস্ত করে, আদেশ ঝাড়ে মন্ডল। আবারো তৎপর হয় করিম। রওয়ানা হয় ফিরতি পথে। মনে মনে হিসেব কষে ঘরের কোথায় কত আছে, কি আছে, কার কাছ থেকে কত নেয়া যাবে।

৭

করিম চোখের আড়ালে যেতেই ফতুয়ার পকেট থেকে মোবাইল বের করে মন্ডল। লুঙ্গির গিঁটের ভেতর থেকে বের করে আনে আলগা সিম। নখের খোঁচায় মোবাইলের পেছনটা খুলে এপারের সিম তুলে যত্নে বসিয়ে দেয় ওপারের সিম।

"সমীরদা, আদাব। একটা লাল গাই কি তোমার ওহানে গেইচে?" ফোন তুলে সরাসরি কাজের কথায় চলে যায় মন্ডল। ওপারের মিনিট ফুরিয়ে গেলে পুরো ব্যাপারটা আরো খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

মন্ডলের বর্ণনা শুনে সমীর নিশ্চিৎ করে লালী তার হেফাজতেই আছে। রফা হয় পাঁচশত এপার-টাকায়। শর্ত, সেদিন রাতের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে লালীকে। দেরী হলে প্রতিদিনের খোঁয়াড়ি বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত দুইশত টাকা।

সমীরের সাথে কথাবার্তা পাকা করে খুশিমনে করিমের বাড়ীর দিকে রওনা করে মন্ডল। যেতে যেতে সিম বদলে ফোন করে সুবেদারকে। একথা সেকথায় জেনে নেয় কৌশলে জেনে নেয় ঠিক কোন সময়টায় টহল দল আসবে তাদের গ্রামের ধারের সীমানা বেড়ার কাছে। সব ঠিকঠাক হলে এবারে ফন্দি আঁটতে থাকে কি করে করিমের মেয়েকে সাথে নেয়া যায়।

৮

পাঁচশ টাকার কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে করিম, "মুই এত টাকা কোটে পামু? আমার ঘরত দুইখান পঞ্চাশ টাকার লোট আছে, ওই নিবার পারেন।"

"তোমাক টাকা দিবার কচ্চি কি আমি? আমাক কেবল করিমনেক সাখত দাও। আমি ওক নিয়া লালীক লয়া আসি। লালী আসলে পর কিস্তি কর্য়া টাকা শোধ দিও।"

মণ্ডলের কথায় আশা ফিরে পায় করিম। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না গাই ছুটাতে করিমনের দরকার হবে কেন? করিমের দোলাচল বুঝতে দেরী নেয় হয় না ধূর্ত মন্ডলের। আগেই তৈরী করে রাখা ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে লোভনীয় প্রস্তাবটিকে যুক্তিযুক্ত করে তোলায় সচেষ্ট হয় সে, "করিমনের চেয়ে ভালো করি আর কে চেনপে লালীক। ওক না নিলি আমি কেঙ্কা বুঝপো কার গাই কাক ফেরত দিল?"

মন্ডলের সহজ যুক্তিতে করিমের ইতস্ততঃ ভাব কেটে যায়। "করিমনের মা, তোমার চ্যাংরিক কও রেডি হবার। লালীক আনপার যাবি," নির্দেশ স্থানান্তরে বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখায়না সে।

নসিমন পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। মন্ডলের কথায় এত সহজে আশ্বস্ত হয় না সে। কারণে অকারণে করিমনের মুখে-মাথায় মন্ডলের হাত দেয়ার চেষ্টা এতদিন দেখেও না দেখার ভান করেছে সে। ভেবেছে গরীবের মেয়ের গায়ে মেস্বর-মাতবররা তো একটু-আধটু হাত দেবেই, এতে তো আর মেয়ের বিয়ে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে না। তবে এই বিকেল সাঁঝে নির্জন মাঠে মন্ডলের সাথে তার মেয়ের একা একা যাবার কথা শুনে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে মায়ের মন।

"করিমনের বাপও সাখত যাক। বাপ বেটিত মিলা লালীক আরো ভাল করি চিনে লিবি," মন্ডলের প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধীতা করার সাহস হয় না নসিমনের।

"লোক বেশী হলে শোরগোল হবি। বি ডি আর, বি এস এফ টের পালি গাইগরু তো দূরত থাক, জান নিয়া টানাটানি হবি" আবারো তৈরী উত্তর দেয় মন্ডল।

"তালি করিমনের বাপ ফাঁকত থাকি যাওক। অচুকা লোক দেকলি উনি না আগাইব?" ক্ষীণ স্বরে আরো একবার চেষ্টা করে করিমন।

"ওই করিমনের মা, আনশুন কতা কেনে কও? মুই বুইড়া কি তোমার ওই নাহায়েজ মাইয়াক সাঙ্গা করবার নিচ্চিক? মোক সাত তোমার চ্যাংরিক নাদেমা তো নাই। তোমরা গিয়া তোমাগোর গাই গরু ধরা নিয়া আস?"

মন্ডলের ছুঁড়ে দেয়া শেষ অস্পষ্ট ঠিকই কাজ দেয়।

"তুই এত আংসাং কতা কইস কেনে বউ? তোর মেয়া দিনে-দুপুরে একলা পাথারত গেইনু, আইজ তো ওর মন্ডল দাদু থাকপে? ভুল গাই নিয়া আলি তুই কি আবার দন্ডী দিবি?" স্ত্রীকে শাসন করে মেয়ের দিকে ফেরে করিম, "ওই চ্যাংরি, একা করি না কান্দি যা লালীক নিয়া আয়। লালীক নিয়া না আলি আইজ আর বাড়িত আইস না।"

অনিচ্ছাসত্তেও মেয়েকে মন্ডলের সাথে ছেড়ে দেয় নসিমন। মনে মনে আল্লার কাছে হাত তোলে, "আমার চ্যাংরিটাক দেকিস তুই খোদা?"

করিমের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট দুটো নিয়ে পকেটে ভরে মন্ডল। করিমনের হাত ধরে সীমান্তবর্তী পাথারের দিকে রওনা হয়। মন্ডলের ঘামে ভেজা হাতের চাপ কেবলই শক্ত হতে থাকে করিমনের হাতে। অস্বস্তি বোধ করে করিমন। বারবার ফিরে তাকায় পেছনে। দাওয়ায় দাঁড়ানো মায়ের শরীর ছোট হতে হতে হারিয়ে যায় এক সময়।

৯

গাঁয়ে ফিরে শান্তি পায়না জীবন। কেবলই মনে হতে থাকে করিমনের কথা, লালীকে হারিয়ে না জানি কত গালমন্দ

খেতে হচ্ছে তাকে? ইস, তার জন্যই তো করিমনের এই দশা। সে ওরকম আচমকা দৌড় না দিলে লালীও হয়তো ছুটে পালাত না। কিছু একটা করার জন্য ছটফট করে কিশোর মন। মনে মনে ভাবে, লালীকে একবারের জন্য খুঁজে পেলেও ঠিক দিয়ে আসবে করিমনের কাছে। যেই ভাবা সেই কাজ। গাঁয়ের এদিক ওদিক ঘুরে সবাইকে শুধায়, "একটা লাল পাভী দেকিচ্ছ বাহে?" বড় রাস্তা পেরিয়ে ওপারের গাঁয়ে এক ঘুরলি দিয়ে আসে। জলঢাকার ধার ঘেঁসে এগোয় খানিকটা। তৃষ্ণার্ত লালী নিশ্চয় জল খেতে চাইবে। কোথাও লালীকে খুঁজে পায় না, জীবন। হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা, সমীর প্রধানের খোঁয়াড়িরা ধরে নি তো লালীকে? গ্রামের শুরুতেই তো প্রধান কাকুর খোঁয়াড়। দ্রুত হেঁটে প্রধানের খোঁয়াড়ে পৌছে যায় জীবন।

"কিরে জেবনা, তোর বাপে এবার কি রং করি দিল আমার সাদা কেশ তো সব বাহির হয় গেল?" জীবনকে দেখেই অভিযোগ শুরু করে প্রধান।

শুকনো হাসিতে কোনরকমে প্রধানের অভিযোগের উত্তর দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই লালীকে দেখতে পায় জীবন। খোঁয়াড়ের একধারে বাঁশের খুঁটার সাথে বাধা লালী। লেজের বাড়ীতে পিঠের ক্ষতে বসা মাছি সরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে বারবার। অচেনা পরিবেশে ভীত ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর লালীকে দেখে মায়া হয় জীবনের।

"ওই লাল গাইটাক আমি ওপার থিকা আসপার দেকচি?" লালীর দিকে ইঙ্গিত করে বলে ওঠে জীবন।

"তুই ঠিকই দেখচু। ওটাক আইজ আগ সাঞ্জত নিবার আসপি।"

"তুমি ওটাক কিছু খের-আড়া দিবা না? ওর ঘাওত একটু মালিশ লাগায়ে দিবা না?"

ওপারের সাথে দ্রুত রফা হওয়ায় লালীকে নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামায়নি প্রধান। তবে গো-গবাদির প্রতি জীবনের বিশেষ স্নেহের কথা গাঁয়ের আর সবার মত তারো জানা। জীবনের এই গো-প্রীতির সুযোগ নিয়ে ওকে দিয়ে লালীকে যদি কিছুটা দলাই-মলাই করে তৈরী করে নায়া যায় মন্দ কি? টাকার আমদানি না বাড়লেও এতে প্রধানের খোঁয়াড়ের সুনাম তো আসবে।

"তুই যা, ওক নদীর পার নিয়া জল খাবার দে। তোর বাপেক ক এন্টি-সেপটিক লাগায় দিবার ওর গাওত? সব সারি আবার এটে লিয়ে আসপি তাড়াতাড়ি।"

প্রধানের কথায় আনন্দে নেচে ওঠে জীবনের মন। প্রায় দৌড়ে লালীকে নিয়ে বের হয়ে যায় সে প্রধানের খোঁয়াড় থেকে। অবাক হয়ে ওদের যাত্রা পথের দিকে ঋণিক তাকিয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মন দেয় সমীর। ভাবে পাঁয়ের সবাই এভাবে বেগার দিলে তার খোঁয়াড় চালানো কত সোজা হয়ে যেত?

১০

লালীকে নিয়ে সোজা নিজেদের বাড়ীতে চলে আসে জীবন। ধবলাকে দিয়ে সুন্দর করে চেটেপুটে সাফ করে লালীর ঘায়ের জায়গা। বাবার ঘর থেকে মলমের কোঁটা বের করে যত্ন করে মেখে দেয় ঘায়ে। ধবলার জন্য তুলে রাখা ফ্যানের অর্ধেকটা খেতে দেয় লালীকে। যত্ন-আদর শেষে লালীকে আবার প্রধান কাকুর খোঁয়াড়ে রেখে আসার কথা মনে হতেই বিদ্রোহ করে ওঠে জীবনের মন। প্রধান কাকু কার না কার কাছে কত টাকার লোভে পড়ে লালীকে দিয়ে দিচ্ছে, তা কে জানে? এটা হতে দেয়া যায় না। যেভাবেই হোক করিমনের লালীকে ফিরিয়ে দিবে সে করিমনের কাছে। প্রধান কাকুকে বলবে লালী ছুটে গেছে তার কাছ থেকে। যেমনি ছুটে এসেছে ওপার থেকে তেমনি ছুটে ফিরেছে ওপারে।

যেই মনে হওয়া সেই কাজ। লালীকে নিয়ে পাথারে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে পথ দেয় জীবন। খোঁয়াড় এড়ানোর জন্য ঘুরপথ নিতে হয় তাকে। পথে যেতে যেতে ভাবে করিমনকে কি করে খুঁজে পাবে লালী? মনে মনে প্রার্থনা করে, "হে ভগবান, করিমনেক লালীর খোঁজে বেড়ার কাছে নিয়া আসেক।" প্রার্থনা বিফল হলে লালীকে সাবধানে বেড়া পার করে দেয়ার পণও করে সে। একবার বেড়া পার হলে লালী নিশ্চয় খুঁজে পাবে তার ঘর। একবার সে মাঠে ঘুমিয়ে পড়লে ধবলা নিজেই দড়াডিসমেত ফিরে গিয়েছিল তাদের ঘরে।

১১

ওদিকে জীবনের দেরী দেখে বিচলিত বোধ করে প্রধান। বিকেল যায় যায়। সাঁঝের শুরুতেই বেড়ার পাশ দিয়ে যাবে টহল দল। গরু আদান-প্রদানের ব্যপারাটা কোনভাবে তাদের চোখে পড়লে মুক্তিপণের টাকার অর্ধেকটাই তাদের দিয়ে দিতে হবে। মুনিষদের একজনকে জীবনের বাড়ির দিকে পাঠায় প্রধান, "ওই মদনা, যায়া দেখ তো পরামানিকের পো আর ওর বলদডায় মিলে মোর গাইটাক চুইদবার লাগছেন কি? কানটা ধর্যা ওক লিয়া আয়া।"

মদনা দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দেয়, জীবন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে বেশ খানিকটা আগে। সঙ্গে নিয়ে গেছে

গাইটিকে। খোঁয়াড়ের পেছনে বল খেলছিল যারা তাদের একজন দূর থেকে জীবনকে দেখেছে একটি গরুর দড়ি হাতে সীমানা বেড়ার দিকে যেতে।

ঘটনা শুনে মাথায় রক্ত উঠে যায় প্রধানের। এখন বুঝতে পারে পরামানিকের পো কেন এত খুশিমনে বেরিয়ে গিয়েছিল। এক টানে চেয়ার থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দেয় প্রধান। হুকার দেয় মদনার উদ্দেশ্য, "সব কডারি ডাক। শালা পরামানিকের চ্যাংরাক আজ গো-মাইজির গোবর খিলাকে দোমো?"

দলবল নিয়ে সীমানা বেড়ার দিকে রওনা করে প্রধান।

১২

সীমানা বেড়ার কাছে পৌঁছে ধীরে সুস্থে প্রধানকে ফোন দেয় মন্ডল। খুব একটা তাড়া নেই তার। মনে মনে আশা গরু নিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নামুক। জনহীন অন্ধকার মাঠে সে, করিমন আর এক নির্বাক প্রাণী। ভাবতেই একটা শিরশিরে অনুভূতি হয় মন্ডলের।

মন্ডলের সিম অদল-বদল দেখে বিস্মিত হয় করিমন। পাপিয়া মেডামের মোবাইলে তার মাকে দু'একবার দুধের গাড়ীর সাথে কথা বলতে দেখেছে সে। তার জানা ছিল না এই জিনিশ দিয়ে ভিন দেশের লোকের সাথেও কথা বলা যায়। ইস, তার এমন একটি থাকলে জীবন দাদার সাথে রাত-বিরাতে কত কথা বলা যেত। জীবন দাদা খোঁজ লাগালে তাদের লালীকে হয়ত সে এতক্ষণে পেয়েও যেত।

গরুর দড়ি হাতে ওপারে একজনকে বেড়ার দিকে আসতে দেখে উৎসুক হয়ে ওঠে মন্ডল আর করিমন। গরু বেড়ার যতই কাছে আসে ততই পরিস্কার হয় তার উজ্জ্বল লাল রঙ। সন্দেহ যায় না তবু মণ্ডলের,

"প্রধান তো একা আসপার নোক না। শালা কাক খুয়ে কাক ফোন করলাম। বি, এস, এফের লোক আবার টোপ লিয়ে আসিচ্ছে না তো?"

করিমনের তখন মহানন্দ। লালী আর লালীর দড়ি ধরা কিশোর, দু'জনই তার অতি পরিচিত, অতি কাছের। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করে করিমনের। ইচ্ছে করে একা-দোকান চেয়েও অনেক অনেক বড় একটা লাফ দিয়ে বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে এক দৌড়ে লালী আর জীবন দাদার কাছে পৌঁছে যেতে।

হঠাৎ হৈ হৈ রবে আবারো সচকিত হয় মন্ডল। দেখতে পায় লাল গরু আর রাখালের দিকে তেড়ে আসছে একদল লোক। ধাওয়াকারীদের সামনে প্রধানের পুষ্ট ভুঁড়িটা দেখতে পেয়ে

কিছুটা স্বস্তি বোধ করে মন্ডল। যদিও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না কি ঘটছে।

"জীবন দাদা, আইগাও। ও মন্ডল দাদু, জীবন দাদা লালীক নিয়া আসচে। ওক আপনি বাঁচান," করিমনের চিৎকারে আবারো বিভ্রান্ত হয় মন্ডল। এইটুকুন মেয়ে কি করে ওপারে কানেকশন বানাল, কিছুতেই মাথায় ঢোকে না তার। দ্রুত মোবাইলের রিডায়ালে চাপ দেয় প্রধানকে ধরার জন্য।

ওদিকে প্রাণপণে ছুট লাগায় জীবন। বেড়ার এপাশে যে জায়গায় করিমন আর মন্ডল দাঁড়ানো সেদিকে না গিয়ে নদীর দিকে এগোয় সে। উদ্দেশ্য প্রধান কাকুর হাতে ধরা পড়ার আগেই নদীর কিনারে বেড়ার খোলা জায়গা দিয়ে লালীকে পুশব্যাক করে দেয়া।

এদিকে করিমনকে দেখে যেন চিনতে পারে লালী। নদীর দিকে না গিয়ে সরাসরি বেড়ার দিকে করিমনের পাশে যেতে চায় সে। জীবনের সরব শাসানিতে কাজ হয় না কোনই।

লালীর হাঙ্গা, প্রধানের দলের হৈ চৈ, করিমনের আতঁচিৎকার আর জীবনের শাসানিতে হঠাৎ করেই সরগরম হয়ে ওঠে

চারদিক। সীমানা বেড়ার দুপাশ জুড়ে চিৎকার চেঁচামেচিতে মনে হয় স্টেডিয়ামে দুদেশের ফুটবল খেলা হচ্ছে, আর বেড়া ঘেরা গ্যালারি থেকে বাহবা আর দুয়ো বর্ষন করে চলেছে দর্শকদল।

"হল্ট, শালা স্মাগলার। হল্ট নেই তো মে গোলি চালা দেঙ্গা।" উদ্যত বন্দুক হাতে সীমানা প্রহরীর গর্জন শুনে নিমেষে স্তব্ধ হয় সকলে। সন্ধ্যা নামার আগেই চলে এসেছে আজ বিএসএফের টহল প্লাটুন।

প্রধানের দল দৌড়ে পালায় যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। করিমনের হাতছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটে পালায় মন্ডল।

পালায় না শুধু জীবন পরামানিক। একটা শেষ চেষ্টা করে সে। দুই হাতে কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে লালীকে ওপারে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করে। শক্ত স্টিলের বেড়া ফাঁক হয় না এতটুকু। বরঞ্চ ছড়ে ছিড়ে যায় জীবনের হাত। তবুও দমে না বালক। ক্রমাগত চেষ্টা করে যায় সে, লালীকে করিমনের কাছে পৌঁছে দেয়ার।



Art by **Rajarshi Bose**



শারদীয় উৎসব

উপলক্ষে মিলনীর সদস্যদের

অশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানাই

জয়দ্বীপ ও রশ্মি ভৌমিক



Question:

Will your retirement portfolio live as long as you?

An Answer:

If you still have at least \$1,000,000 of investable assets you are invited and encouraged to seek solutions!

Consider a private dinner at a restaurant of your choice (one-on-one... not a seminar) with investment strategists Sanjoy Dasgupta and Susan Perron. Dinner is on us. No obligation.



Who we are: We are very selective asset gatherers.
We are responsible wealth managers.
We are retirement specialists.

Check us out at: www.dasgupta-perron.com

Call: 303.486.1622 or

Email: sue@dasgupta-perron.com



DASGUPTA & PERRON

Dynamic Investing in a Global Marketplace

...
5445 DTC PARKWAY ... SUITE 1025 ... GREENWOOD VILLAGE CO 80111
303.486.1622

...
Registered Representative, Securities offered through Cambridge Investment Research Inc.,
A Broker/Dealer, Member FINRA/SIPC, Investment Advisor Representative,
Cambridge Investment Research Advisors, Inc., a Registered Investment Advisor.
Cambridge and Dasgupta & Perron are not affiliated.

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

কৃষ্ণেন্দু কুমার দাস

আরে এষে রমানাথ, এসো এসো ভাই
খাসা এক গল্প আছে, শুনে যাও তাই,
ঘটঘট পটপট চলে কত যন্ত্র
কারখানায় যায় দেখা, কাজই তার মন্ত্র।

বড়বড় চাকা ঘোরে, পুলি কলকজা
সুইচ টিপে ঘোরালেই, খুলে যায় দরজা
চারিদিকে দেখা যায়, জীবন এতে ভরা,
হার্ডওয়্যার বলে তাকে, হাতে যায় ধরা।

আরে আরে রমানাথ, কেন এত ব্যস্ত,
সফটওয়্যার কাকে বলে, জানবে সমস্ত
সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার, আসলেতে ভাই ভাই,
একটি না থাকলে, অন্যটির ঠাই নাই।

আধুনিক কালে আজ, সফটওয়্যার চলে
টুথব্রাশ থেকে কম্পিউটার, কথা তাহা বলে।
এক সেকেন্ডে করে সে, একশো দিনের কাজ
দিন রাত ছুটি নেই, নেই কোন মেজাজ।

সফটওয়্যার যায় না ধরা, যায় শুধু দেখা
গনিত বিদ্যায় দক্ষ হলে, আপনি যায় শেখা
মঞ্জলে যায়নি মানুষ, গেছে সফটওয়্যার
কৌতূহল নাম তার, সাথে হার্ডওয়্যার।

আপন আইন তৈরি করে, এগিয়ে গেছে তারা
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে, মানুষের দ্বারা,
হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, ভুল করে না কোন
বাঁধা সব একই তারে, একই সুরে যেন।

বিচার চাই

মাকসুদা আইরীন মুকুল

জেগেছে নবীন, মুক্তির নিশানায়
ডেকেছে তরুণদল
মিলেছে সবাই, স্বাধীন এক চেতনায়
গোটাদেশ অবিচল।

বিচার, বিচার, বিচার,
চাই দেশদ্রোহীর বিচার।

সেই বায়ান্নতে
যুক্তিতে এসেছে মুক্তি ভাষার,
ভালোবাসা আর সংগ্রামে পেয়েছি
মুক্ত স্বাধীন দেশ -
সুস্থ জীবনে বাঁচার

পেরিয়ে গেছে, গড়িয়ে গেছে

মাস, বছর, দশক

তবুও শুধতে পারিনি ঋণ

শহীদী আত্মদানের।

গুটি গুটি পায়ে বেড়ে উঠে তারা

আবর্জনার দল

দখল নিয়েছে বহু ত্যাগে অর্জিত

স্বাধীনতার ফসল।

এখন সময় এসেছে রুখে দাঁড়ানোর

উঠেছে জেগে তরুণ

উঠেছে জেগে জনতা

জাতি নেবে আজ বদলা

যুদ্ধ হবে সফল।

বিচার, বিচার, বিচার,

চাই রাজাকারের বিচার।

Kolkata Street Food – Phuchka and Churmur

Roshmi Bhaumik

When I was a kid, I used to live in South Kolkata. The Rabindrasarovar lake was just a block away from our apartment building. A phuchkawala would come every afternoon around 4pm and set up his wicker stand across the street from the lake. He carried on his head, a huge wicker basket covered with a red cloth. He would set the basket on top of the stand. Under the red cloth of this basket were the secret ingredients that made the phuchkas and churmurs absolutely addictive.

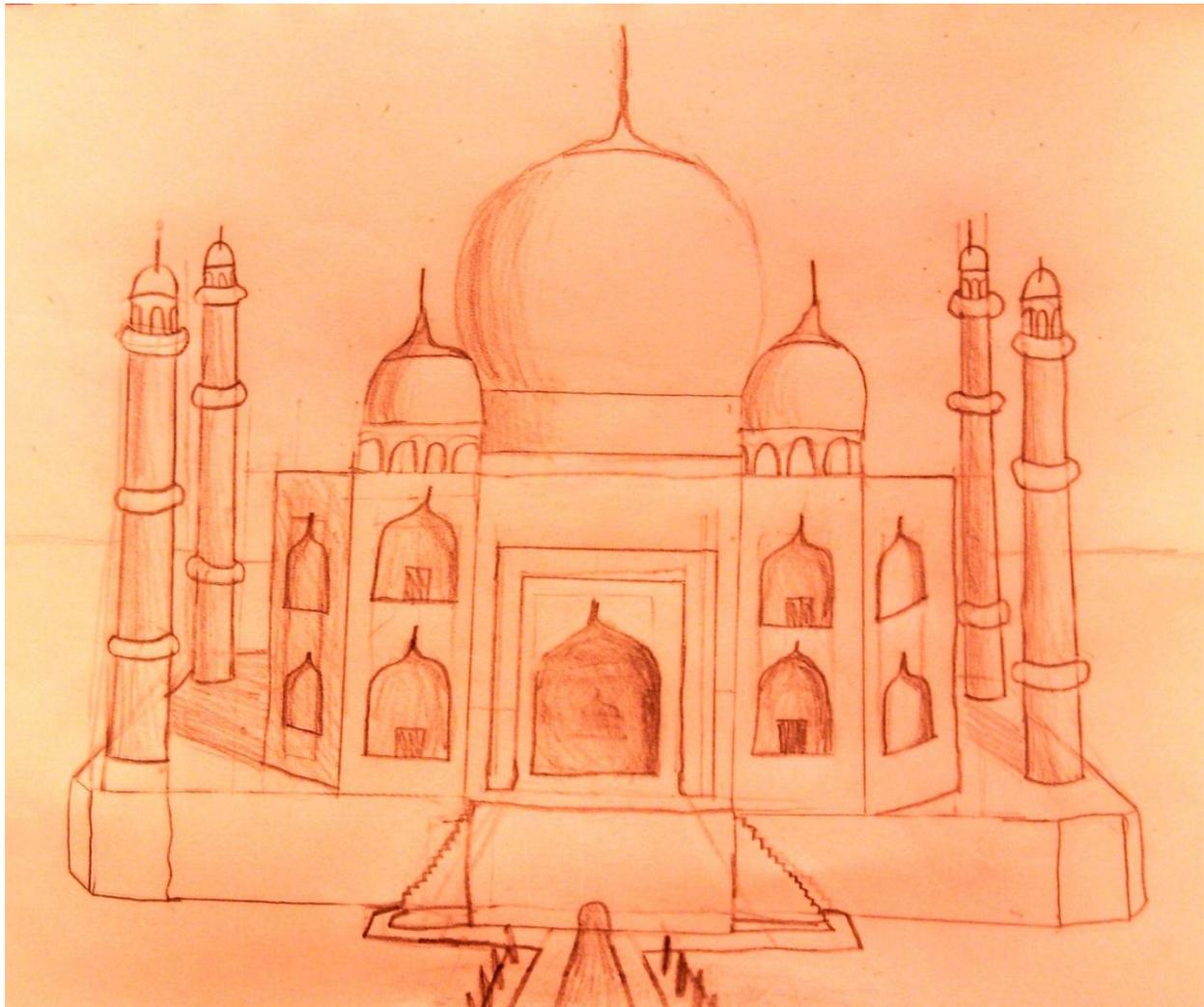
Most Bengalis argue that they can never make the above dishes taste as mouth-watering as the phuchkawalas do. There is a common joke that this is entirely due to the vendor's special "hands" and everything that comes with it.



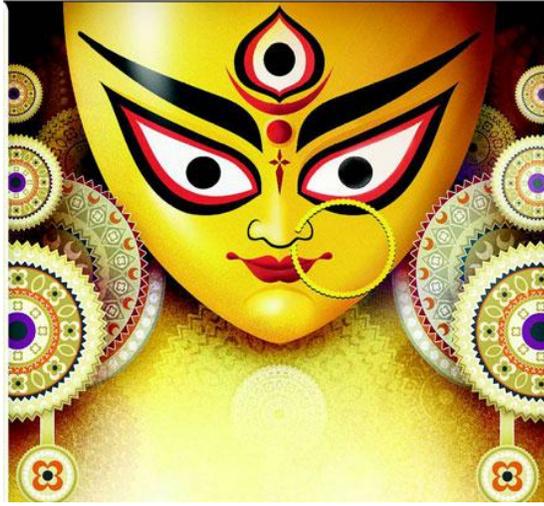
The phuchkawala, used to, successfully, lure the school children, returning home and the people who used to come to stroll around the lake, in the evening. People would crowd around the stand in small groups. The dark skinned tall man only showed his white teeth in approval. Conversations were minimal. Showing the number of phuchkas was good enough for him. He would make bowls out of dry "shaal" leaves with a toothpick-like thin piece of stick to hold the shape. This would be distributed to all the customers. He would then start mixing stuff in his dented aluminium deep-dish. First the boiled potatoes and then the boiled chickpeas were hand mashed into smoother dough like consistency. His hands would then run swiftly picking various masalas from the small containers hidden below the red cloth as if to stealthily add the final touch to floor his customers. Then the thin crisp balls, "phuchkas", would be popped by the thumb of his left hand. A small portion of the mixture will be stuffed in it. Finally it would be dunked in the huge earthen pot of tamarind water and delivered to the expectant group in perfect order. I found the hardest part was to keep up with his rate of supplying. Even before I had

finished relishing the one in my mouth , he was done with his round and had come back to me. I felt pressured not to miss my share and it became an exercise in gobbling...

I, personally, preferred the slight variation of phuchka , the less known **churmur**, which I could relish slowly all the way home without the fear of losing some of the phuchkas to faster gobbling friends. Of course I have to admit that it had lot less tamarind water than its cousin. But we make compromises in life and I opted for the long-lasting one! Basically it was the magical mixture plus the crisp round phuchkas crumbled into it and some tamarind water enough to make it moist and entirely irresistible. You don't believe me? Just try it ☺☺



Art by **Rajarshi Bose**



Best Wishes from our Donors

*Siddhartha and Gayatri Baral
Rathin & Mira Basu
Raghu & Soma Bhattacharya
Shubhadeep & Baishakhi Chakraborty
Tripureswar Chattopadhyay
Kaushik & Arjita Dam
Suman & Priya Dutta
Debayan Majumdar
Malay Nandi & Sarita Misra
Joydeep and Anuradha Mukherjee
Hemanta & Mita Mukherjee
Souvik & Tuhina Nandi
Avi & Arundhuti Parakayasta
Deepak & Suhita Sinha
Alpana Chaudhuri Sinha & Krishna Sinha
Sourav and Priyanka Sinha
Sumit & Surupa Sur
Jason and Kathi Weaver*



মৃত্যুঞ্জয়

কৃষ্ণেন্দু কুমার দাস

সঞ্জয় গোটা কলেজে বেশ ডাকাবুকো ও একরোখা ছেলে বলেই পরিচিত। সেটা ১৯৯৭ সাল। গোটা কলেজে র্যাগিং এর বিরুদ্ধে যখন সে একা রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন থেকেই তার সহপাঠীরা তাকে সমীহ করে চলত। এমনিতে সে বেশ শান্তশিষ্ট দেখতে হলেও পেটাই চেহারার জন্য তার নাম বন্ধুমহলে উঠে আসত যখনতখন। কলকাতার বাড়ি থেকে যখন তাকে সুদূর কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠানো হয়েছিল তখন তার মা ছেলের চিন্তায় ঘুমুতে পারতেন না। হয়তো প্রথমবার ছেলে বাড়ির বাইরে গেল এত দূরে এই ভেবে। সঞ্জয় জানত তার বাবা মা তাকে অনেক কষ্ট করে এত দূরে পড়তে পাঠিয়েছেন, তাই সে চেষ্টা করত কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়াশোনায় মন দিয়ে বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করার। সঞ্জয় এর বাবা প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট করেছিলেন, কিন্তু সঞ্জয় যখন জন্মেছিল তখন সে সব ছিল অতীত। সঞ্জয়ের বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার। আর মা ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী। ফলে সঞ্জয়কে সুখে সাহসেই মানুষ করেছিলেন তারা। কিন্তু কিছু কিছু জিনগত বৈশিষ্ট্য সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। তার মধ্যে যেমন ছিল নিজেকে কষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন, ছাত্র হিসাবে প্রতিটা পাই পয়সা হিসাব করে চলা, তেমনি ছিল একরোখা জেদ আর বাবা-মার প্রতি অসম্ভব টান ও ভালবাসা।

সেবার Third semester এর পরীক্ষার পর যখন এক মাস কলেজ ছুটি পড়ল, তখন অনেকেই আগেভাগে ট্রেন এর টিকিট কেটে রেখেছিল বাড়ি যাবার জন্য। কলকাতার ট্রেন এর টিকিট এর জন্য এমন হাহাকার আগে সে দেখেনি। সঞ্জয় যখন দেখল অনেক বন্ধুরাই confirmed টিকিট পাচ্ছে না, তখন সে ভাবল টিকিট এর জন্য চেষ্টা না করে fourth semester এর পড়া আগাম করে রাখবে। কিন্তু শেষ পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন থেকেই যখন কলেজ ফাঁকা হতে শুরু করল, তখন তার মনটা বাড়ির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। জুন মাসের এক গরমের সকালে সে সিদ্ধান্ত নিল যে বাড়ি যেতে হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেদিন দুপুরেই এক লিটার জলের বোতল নিয়ে আর পিঠে ব্যাগ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ম্যাঙ্গালুরু বাস স্ট্যান্ড এর উদ্দেশ্যে। হাতে বেশি পয়সা ছিল না। সঙ্গে ছিল কলেজ এর আইডি কার্ড, ব্যাংক থেকে তোলা কিছু ক্যাশ, ব্যাগে ছিল এক সেট জামা কাপড় আর দুটো বই। কলকাতায় বাড়ি যাবার একটা রাফ প্ল্যান সে করে নিল বটে, কিন্তু confirmed টিকিট না থাকায় বেশির ভাগটাই সে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল।

ম্যাঙ্গালুরু থেকে বাসে ম্যাঙ্গালুরু, তারপর রাতের ট্রেনে চেন্নাই, তারপর সেখান থেকে সকালের ট্রেনে কলকাতা, এই ছিল তার প্ল্যান।

ম্যাঙ্গালুরু বাস স্ট্যান্ডে এসে ম্যাঙ্গালুরুর বাস পেতে তার কোন অসুবিধা হল না বটে, কিন্তু বাস এর উইন্ডো সিট পাবার জন্য যেহেতু সে চেষ্টা করছিল, তাই কয়েকটা বাস ছেড়ে বাস ধরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। রাতের জন্য কিছু খাবার আর এক বোতল জল ভরে নিল সে। হাইওয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটন্ত বাস এর জানলার ধারে বসে বসে আকাশের তারা দেখতে দেখতে বাড়িতে বাবা মার কথা মনে হচ্ছিল তার। বাবা মা তাকে হঠাৎ দেখতে গেলে কতই না খুশি হবেন। কিন্তু পরদিন ভোর বেলা তৎকাল টিকিট এর জন্য আবার তাকে চেষ্টা করতে হবে, এই ভেবে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। বড় বড় রেল স্টেশন কাউন্টার থেকে মাত্র দুচারটে তৎকাল টিকিট কোটায় মেলে মাত্র, তাও সাধারণত আগের দিন সকালে দেওয়া হয়। হঠাৎ এক ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে সঞ্জয় দেখল ম্যাঙ্গালুরুর মেজেসটিক বাস স্ট্যান্ডে বাস ঢুকছে। চোখ কচলে ঘড়িটা দেখল সে, রাত চারটে বাইশ। বাস দাড়াতেই সে এক দৌড় দিল ম্যাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল স্টেশন এর দিকে। অনেককে জিজ্ঞাসা করে তৎকাল টিকিট কাউন্টারের সামনে আসতেই সে হতাশ হয়ে পড়ল সে। আগের দিন রাত থেকে লোক লাইন দিয়ে শুয়ে আছে সেখানে। তার আগে লাইনে দশ জন। ভাগ্য তার খুলল না, তৎকাল টিকিট পাঁচ জন এর পরেই শেষ হয়ে গেল। স্টেশনের পেড রেস্ট রুমে ফ্রেশ হয়ে এক দোকানের খোসায় কামড় দিতে দিতে সে পরবর্তী প্ল্যান করতে বসল। ম্যাঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই অনেক ট্রেন আছে সারাদিনে, কিন্তু ৭-৮ ঘন্টা লাগে যেতে। দিনের বেলায় ট্রেন ধরলে চেন্নাই পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, তখন সেখানে রাত কাটান অসুবিধা। যেহেতু কলকাতার ট্রেন পরদিন চেন্নাই থেকে সকালে, তাই রাতটা সে ঠিক করল চেন্নাইগামী ট্রেনেই কাটাতে, অর্থাৎ ম্যাঙ্গালুরু থেকে রাতের ট্রেন ধরতে হবে। সঞ্জয় জানত এই সব ট্রেন এর আগে আর পরে দুটো করে জেনারেল বগী থাকে, reservation না থাকায় তাকে সেখানেই উঠতে হবে প্রতিটি ট্রেনে, এবং তার জন্য তাকে সেখানে জায়গা করে নিতে হবে।

সারাদিন ম্যাঙ্গালুরুতে ঘুরে রাত ন'টা নাগাদ সে এক নম্বর প্লাটফর্মের একদম প্রান্তে এসে দাঁড়াল চেন্নাই মেল ধরবে

বলে, তখন আরেক মুশকিল দেখা দিল। সঞ্জয় জানত না কোনদিকটা চেনাই, অর্থাৎ ট্রেনটা কোনদিকে যাবে, ইঞ্জিনটা কোনদিকে থাকবে, এদিকে না ওদিকে। ইঞ্জিন যেখানে দাঁড়াবে, তার পরেই থাকবে জেনারেল বগী, তাই সেগুলোর পজিশন ফিক্সড, আর শেষের বগীদুটো নির্ভর করে ট্রেনটা কতটা লম্বা হবে তার ওপর। ট্রেন বেশি লম্বা হলে সেগুলো স্টেশন ছাড়িয়ে চলে যেতেও পারে, তাই সেগুলোর পজিশন ভ্যারিএবল। যেহেতু তাকে জেনারেল বগী ধরতেই হবে, তাই সেগুলোর পজিশন তাকে জানতেই হবে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একজন রেল পুলিশ দেখতে পেয়ে সঞ্জয় ভাবল একে জিজ্ঞাসা করা যাক। পুলিশ তাকে যা বলল তার সারমর্ম হল, সে জানে না কোনদিকে ইঞ্জিন থাকবে, তবে ওই দূরে রেল ইয়ার্ডে জেনারেল বগীগুলো দাড়া করান থাকে, সেগুলোই ট্রেনের পিছনে বা সামনে জোড়া হয়। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে রাত সাড়ে ১১ টা, তাই সঞ্জয় ঠিক করল, রাতটা কাটাতে গেলে একটা সিট তাকে পেতেই হবে এবং সেজন্য তাকে রিস্ক নিতেই হবে। এইসব ভেবে সে স্টেশন ছেড়ে লাইন পেরিয়ে রেল ইয়ার্ডের দিকে হাটা শুরু করল। নিকষ কালো অন্ধকারে লাইন এর মধ্যের নর্দমা স্তম্ভপর্মে পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, সে দুটো ভুল করে ফেলেছে। এক, এই অন্ধকারে কোন বগীগুলো চেনাই মেলের, তা ঠাওর করা মুশকিল। অন্য বগীতে উঠলে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। দুই, বগীগুলোর দরজা এই ইয়ার্ডে খোলা নাও থাকতে পারে, তখন মুশকিল হয়ে যাবে। প্রায় একঘণ্টা কালো অন্ধকারে হাঁটার পর তার চোখ কিছুটা সয়ে এলে সে দূরে বগীগুলো দেখতে পেল। কিন্তু সেগুলোর কাছে এগোনোর আগেই একটা গোলমাল শুনতে পেল সে। কারা যেন মদ্যপ অবস্থায় ঝগড়া করছে। একটা কামরার গায়ে লুকিয়ে পড়ার পর কথাবারতা শুনে সে বুঝতে পারল এরা সমাজবিরাগী, টাকা পয়সা ভাগ বাটোয়ারা চলছে। অন্ধকারে একটা ছুরিও ঝলসে উঠল। কিছুক্ষণ পরে টর্চের আলো আর বাঁশির আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারল পুলিশ আসছে। অনেঙ্কন লুকিয়ে থাকার পর সব শান্ত হয়ে গেলে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে বগীগুলোর দরজা খোলা কিনা হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল। একটা বগীর দরজা খোলা পাওয়ায় সঞ্জয় তাতে উঠে পড়ল। বগীটা চূড়ান্ত অন্ধকার, কোন আলো নেই, তাও হাতড়ে হাতড়ে একটা বাক্সের সিটে সে উঠে টানটান হয়ে শুল। এবার একটাই চিন্তা, এটা চেনাই এক্সপ্রেসের কামরা কিনা। যাক, যা হবার হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে সারাদিনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সঞ্জয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তারপর কখন যে কামরায় আলো

জ্বলেছে, তারপর তা ট্রেনের সঙ্গে জুড়েছে, লোক উঠেছে, ট্রেন চলেছে, তা সঞ্জয় নিজেও জানে না।

ভোরবেলা ঘুম পাতলা হয়ে যাওয়ায় সঞ্জয় বুঝল ট্রেনটা অনেকক্ষণ ধরে চলছে না। সে উঠে পড়ে দেখল গোটা কামরা লোকে লোকারণ্য, সবাই ঘুমোচ্ছে, বাস থেকে নামার জো নেই, একবার নামলে সিট চলে যাবে, আর তা পাওয়া যাবে না। ঘড়িতে পাঁচটা দুই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর এমনি সিগনালে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়, তাকে পরবর্তী ট্রেন ধরতে হবে সকাল নটার মধ্যে চেনাই থেকে। তাই একবার নেমে দেখতেই হচ্ছে। সিট ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দু'এক জনের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝল ভাষা সমস্যা বিরাট। জেনারেল বগীর লোকজন ইংলিশ বা কানাড়া জানে না, আর সঞ্জয় তামিল জানে না। সময় চলে যাচ্ছে, সঞ্জয় ট্রেন থেকে নেমে পড়ে হাটা লাগাতে গিয়ে থমকে গেল, ট্রেন লাইন এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, কোনদিকে কোন স্টেশন নেই, শুধু চারটে লাইন আর ধানক্ষেত। সঞ্জয় বুঝল, দুটো লাইন সম্ভবত এক্সপ্রেসের, আর দুটো লোকাল ট্রেন এর। অর্থাৎ, কোন বড় শহর আছে সামনে, আর ভোর হওয়ায় সেটা চেনাই হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু, সে কাছাকাছি এসে পড়েছে বুঝতে পারছে, কিন্তু যেহেতু সে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, সে জানে না ট্রেন কোনদিকে যাচ্ছিল, অর্থাৎ চেনাই কোনদিকে, আর জানে না কত দূর সেটা। ভাষা সমস্যার জন্য জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছে না। কিছু একটা ডিসিশন নিতেই হবে, এই ভেবে সে একদিকে লাইন ধরে হাটা লাগাল, যদি কোন কাছের শহরে গিয়ে বাস ধরা যায়। হাঁটতে হাঁটতেই সে দেখতে পেল ট্রেন এর নাম ব্যাঙ্গালুরু-চেনাই এক্সপ্রেস। অর্থাৎ, তার ঝুঁকি কাজে লেগেছে, সে গতকাল রাতে ঠিক বগীতেই উঠেছিল। ভোরের নরম আলো তখন সদ্য ফুটেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হটাত সঞ্জয় দেখল পরের পর এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একই লাইনে। জিজ্ঞাসা করে সে বুঝল সামনের ট্রেন এর ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। তাই সব পরপর দাঁড়িয়ে গেছে। না নামলে তাকে ওখানেই আটকে থাকতে হত। কিছুদূর গিয়ে সঞ্জয় একটা ওভার ব্রিজ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। ব্রিজ মানে সামনেই কোন বড় রাস্তা আছে বা কোন স্টেশন আছে। একটু দূর গিয়েই সে দেখল একটা স্টেশন, আর তাতে একটা লোকাল ট্রেন হর্ন দিয়ে ছাড়ব ছাড়ব করছে। সঞ্জয় প্রচণ্ড জোর দৌড় লাগাল আর কোনরকমে একটা কামরায় উঠে পড়ল। কামরায় উঠে সে দেখল অনেক অফিস যাত্রী, কারন এদের ড্রেস ফরমাল আর হাতে অফিস

ব্যাগ, অর্থাৎ এরা ইংলিশ জানে। সঞ্জয় এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে। তিনি আবার অবাক হয়ে সঞ্জয়কেই প্রশ্ন করলেন যে ট্রেন কোথায় যাচ্ছে না জেনেই কিভাবে সে ট্রেনে উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পরে সঞ্জয় বুঝতে পারল সে ঠিক লোকাল ট্রেনই ধরেছে, এই ট্রেন চেন্নাই এর দিকেই যাচ্ছে, কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। লোকাল ট্রেনটা যাচ্ছে চেন্নাই এগমোর, আর সঞ্জয় এর কলকাতাগামী ট্রেন ছাড়বে চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে। দুটো আলাদা আলাদা স্টেশন। সঞ্জয় আবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল দুটো স্টেশনের মধ্যে কোন ট্রেন আছে কিনা। তিনি বললেন নেই, কারণ ওই দুটি প্রান্তিক স্টেশন, আর এদের মধ্যে দূরত্ব ২-৩ কিমি। সঞ্জয় বুঝল, এটা অনেকটা হাওড়া শিয়ালদার মত, অর্থাৎ তাকে চেন্নাই এগমোর নেমেই হয় বাস ধরতে হবে নাহলে দৌড়তে হবে চেন্নাই সেন্ট্রাল এর জন্য। সঞ্জয় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল।

চেন্নাই এগমোর আসতেই সঞ্জয় প্রচণ্ড জোরে দৌড় লাগল। কলকাতাগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস চেন্নাই সেন্ট্রালের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সকাল ৭ টা পাঁচে ছাড়ে, আর কলকাতা পৌঁছয় পরদিন বিকালবেলায়। সঞ্জয়কে ট্রেন ছাড়ার এক ঘণ্টা আগেই পৌঁছতে হবে, কারণ দেড় দিনের যাত্রার জন্য জেনারেল বগীর একটা সিঙ্গেল সিট তার চাইই চাই। সঞ্জয় যখন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল তখনো ট্রেন আসেনি। এর মধ্যে অবশ্য সে স্টেশনের পেড রেস্টরুমে ফ্রেশ হয়ে এসছে, কিন্তু পেটে দানাপানি কিছু দেবার সময় পায়নি। সঞ্জয় একদম স্টেশনের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। কিছু মুশকো লোক কুর্তা অথবা জামার হাতা গোটাচ্ছে। অর্থাৎ, ট্রেন পিছন করে এখানেই এসে ঢুকবে আর এরা ধাক্কাধাক্কির জন্য তৈরি হচ্ছে। যেহেতু ট্রেনের পিছনটা আগে ঢুকবে, তখন দুটো জেনারেল বগী থাকবে, আর সেগুলো ঢুকে গেলে আরেকটা চাঙ্গ থাকবে সামনের দুটো, যেগুলো ইঞ্জিন এর পিছনে। সঞ্জয়ের হাতা ছিল না, পরনে ছিল একটা হাফ হাতা গেঞ্জি, তাই হাতা গোটানোর ভান করতে লাগল। যেহেতু কিছু চেহারায় বড়সড়, সে ভাবল এদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করা মুশকিল। আর ট্রেন ঢোকাকালীন মারপিট করতে গিয়ে লাইন এর ফাঁকে পড়ে গেলে মুশকিল হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে দূর থেকে দেখা গেল ট্রেন পিছন থেকে আস্তে আস্তে আসছে। সঞ্জয় লাইনে নেমে ট্রেনের দিকে দৌড় লাগল আগেভাগে ধরবে বলে। কিন্তু ব্যাপারটা সে যতটা সোজা ভেবেছিল ততটা সোজা হল না। প্রথমত, অসংখ্য লাইন এর জাল এর মাঝে সে ঠিক করতে পারল না ঠিক কোন লাইন দিয়ে ট্রেনটা আসছে। দ্বিতীয়ত, ট্রেনটা পিছনে

আসছে, সামনে নয়, তাই এটা ধরা অনেকটা কঠিন। তৃতীয়ত, ট্রেনটা ঠিক যতটা আস্তে আসছে মনে হচ্ছিল, তার থেকেও অনেক জোরে আসছে, পিছন থেকে বলে স্পীড বোঝা যাচ্ছিল না। সঞ্জয় ট্রেনের কাছাকাছি এসে লাইন থেকে সরে ট্রেন এর সমান্তরালে দৌড়তে লাগল। কলকাতায় চলন্ত বাসে উঠে সঞ্জয়ের অভ্যাস ছিল, তাও কোনরকমে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে সে চলন্ত ট্রেনে একটা জেনারেল বগীতে উঠে পড়ল। কিন্তু বিধি বাম। সেই বগীর দরজাটা বন্ধ। সঞ্জয় দরজার সিঁড়িতে ঝুলতে ঝুলতে দরজাটা ঘা দিতে লাগল, ভিতরের কেউ যদি ঝুলে দেয়। হটাত সে দেখল একটা পোস্ট আসছে। এখুনি দরজাটা না খুললে তাকে সেই বগী থেকে লাফ দিতে হবে, নাহলে ওই পোস্টে সে ধাক্কা খাবে। লাফ দেবার আগে ঠিক অন্তিম মুহূর্তে দরজাটা কেউ খুলে দিল এবং সঞ্জয় কামরার ভিতর ছিটকে পড়ল। কামরায় উঠে সে দেখল চারিদিকে খবরের কাগজ পাতা, আর কুলিরা সেগুলো আগলে বসে আছে। অর্থাৎ, ওগুলো অকুপায়ের এবং কিনতে হবে। সঞ্জয়ের মেজাজ গরম হয়ে গেল, সে একটা কাগজ সরিয়ে সিঙ্গেল সিটে বসে পড়ল। কুলিরা হা হা করে তেড়ে এলে সে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ততক্ষণে ট্রেন স্টেশনে ঢুকে পড়েছে, লোক উঠতে শুরু করেছে, কুলিরা সঞ্জয়কে ছেড়ে অন্য সিট বিক্রি করার দিকে মন দিল। এর ঠিক আধঘণ্টা পরে ট্রেন চলতে শুরু করল, সঞ্জয় হাফ ছেড়ে বাঁচল। সূর্যের রোদ আস্তে আস্তে তখন বাড়ছে।

অসহ্য গরম। করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন হবার দরুন স্টপেজ অনেক কম। চেন্নাই থেকে পরের স্টপ ওঙ্গল আসতে চার ঘণ্টা লাগে। কিন্তু তার আগেই সঞ্জয়ের বোতলের জল শেষ হয়ে গেল। ওঙ্গল স্টেশন আসতে সে বুঝল ট্রেনটা এত বড় যে, জেনারেল বগীগুলো স্টেশনের বাইরে পড়ছে। এই অবস্থায় সিট ছাড়া মানে বাকি দেড় দিন দাঁড়িয়ে যাওয়া। আর স্টেশনের বাইরে থাকায় খাবার বা জলও পাওয়া যাচ্ছে না। সঞ্জয় নিজের মনকে শক্ত করে বোঝাল যে, আর মাত্র দেড় দিন তাকে যে ভাবেই হোক কষ্ট করে কাটাতে হবে। সূর্য অস্ত গেলেই চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, জলকষ্টও থাকবে না। সে ব্যাগ থেকে একটা বই খুলে পড়তে শুরু করল। কিন্তু বিকাল বেলায় ভিজয়ওয়াদা স্টেশন আসার পর আর সে থাকতে পারল না। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার জোগাড়। এক বুড়িকে তার সিটের ভার দিয়ে সে পিঠে ব্যাগ নিয়ে জলের খোঁজে লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। স্টেশনে উঠে কিছুদূর গিয়ে এক কলে সে জল খেল প্রাণভরে। নিজের মাথায় এক বোতল জল ঢেলেও দিল। খানিকবাদে এক টিটিকে দেখতে পেয়ে সঞ্জয় গিয়ে তাকে

জিজ্ঞাসা করল রিসার্ভেশন কামরায় সিট কিছু পয়সা দিলে মিলবে কিনা। দশ মিনিটের মধ্যে সঞ্জয় টিটিকে ম্যানেজ করে এস ইলেভেন কামরায় একটা রিসার্ভ সিট পেয়ে গেল। রিসার্ভ সিট পেয়ে সে কিছু খাবার কিনে খেয়ে বাক্সে উঠে ঘুম দিল। ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে।

হঠাৎ একটা চাঁচামেচিতে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল রাত্রি হয়ে গেছে। ঘড়িতে রাত এগারটা। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে আর কিছু মুখোশপরা লোক কামরায় উঠে লোকজনের টাকা পয়সা সোনাদানা লুঠ করছে। দুজন লোক ট্রেনের মেঝেতে পরে কাতরাচ্ছে আর চারিদিকে চাপ চাপ রক্ত। সঞ্জয় বাক্স থেকে নেমে দরজার কাছে যেতেই একজন দৌড়ে এসে তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে ধরল। সঞ্জয় ভাবল এই রিসার্ভ কামরায় না এলে তার এই হাল হয়তো হত না। লোকটা সঞ্জয়ের ব্যাগটা ঘেঁটে কিছু না পেয়ে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। মানিব্যাগটায় বিশেষ টাকা পয়সা না পেয়ে সে ভীষণ রেগে পাশের লোকটাকে কিছু বলল। পাশের লোকটা চেঁচিয়ে কিছু বলতে বলতেই সে রিভলভারের সেফটি ক্যাচটা খুলে ফেলল। সঞ্জয়ের মত সাহসী ছেলেরও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা তার এক আশ্চর্য গুণ। এক লহমায় সে লোকটার মুখে সজোরে এক ঘুসি চালিয়ে দিয়ে ব্যাগ আর মানিব্যাগটা নিয়ে ট্রেন থেকে লাফ দিল। চারিদিকে কালো অন্ধকার। সঞ্জয় তীরবেগে ট্রেন থেকে দূরে দৌড়তে লাগল। লোকটা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেও পলকে

উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে এলোপাখাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। সঞ্জয় দৌড়তে দৌড়তে বুঝতে পারল সে মাঠঘাট পেরিয়ে অনেকদূর চলে এসেছে। আর কেউ তাকে ফলো করছে না। ট্রেন থেকে পাথরে পড়ার দরুন পায়ে অসহ্য ব্যাথা। সারা পায়ে কেটে ছড়ে গেছে। দূরে কিছু চলন্ত আলো দেখে সে বুঝল সে বড় রাস্তার সামনে চলে এসেছে। অনেক কষ্টে নিজের শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে সে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ভুবনেশ্বরগামী ট্রাকের ছাদে তার জায়গা হল। রাতের আকাশে অসংখ্য তারা তখন ঝিকমিক করছে।

ভোরবেলায় একটা ধাবায় সঞ্জয় ট্রাক থেকে নেমে কলকাতাগামী আরেকটা ট্রাকে উঠল। পরদিন ছিল রবিবার। সঞ্জয় যখন ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় নিজের বাড়ির দরজার বেল টিপল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সঞ্জয়ের মা দরজা খুলে হতবাক হয়ে গেলেন। বাবা দৌড়ে এলেন।

পরদিন সকালে খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে তার চোখ আটকে গেল। “ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা, ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে কলকাতাগামী করমগল এক্সপ্রেসের সঙ্গে মালগাড়ীর ধাক্কা। করমগল এক্সপ্রেসের পিছন দিকের কিছু কামরা লাইনচ্যুত হয়ে অন্য লাইনে পড়ার পর অন্যদিক থেকে মালগাড়ী এসে তাকে ধাক্কা মারে। এস টেন থেকে পরের সমস্ত কামরা গুলি দলা পাকিয়ে গেছে।”

পরাজিত মানুষের হেটে চলা

রাসেল সাঈদ

শুভ্র তুষারের উপর দিয়ে বিষন্ন ভাবে
উড়ে যায় এক ধুসর চিল!
ঠিক অনেকটা যেন এক পরাজিত মানুষের মত।
আত্মবিশ্বাস হীন পরাজিত মানুষের
হেটে যাবার করুন শব্দ আমার কানে,
সবসময় বেজে চলে অদৃশ্য এক পেঁপুলামের মতো।
মতিঝিল এর কোনো এক রাস্তায়
এমনি এক পরাজিত মানুষ হেটে চলছে।
ভারী চশমার কাঁচের আড়ালে তার চোখ গিয়েছে হারিয়ে।
টেম্পলর ভাড়া বাঁচিয়ে কেনা দুখানা পেঁপে হাতে হেটে চলছে সে মতিঝিল থেকে বাসে কদমতলা।
জীবন অনেক ফাঁদ পেতেছে তাকে পরাজিত করবার জন্য।
শুধু ওই দুখানা পেঁপে বাঁচিয়ে দিল আজ তাকে।
সাদা তুষাররের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সেই পরাজিত চিলটা ও হয়ত বেচে যাবে তার নীড়ে ফিরে।

Feline Philosophy

Rathin Basu

Preface: *Recently, my brother suddenly came across a copy of our high school magazine from over half a century ago. He scanned and forwarded to me an article in there that was a translation of a chapter called বিড়াল (Biral) from the famous satirical fiction কমলাকান্তের দপ্তর (Kamalakanter Daptar) by the famous writer শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (Sri Bankim Chandra Chattopadhyay). Since I was the infamous translator, I figured it might be fun to share it with you all.*

As I was drowsing over a mild but energizing pull at my *hookah*, which was sending forth swirling smokes above creating weird figures in the air, my mind suddenly caught upon the chances of my success at Waterloo had I had the role of the Duke of Wellington to play! My heroic reverie was suddenly battered by a bellowing “Meeao”.

“What! Wellington! What for? You had had great honors that the nation could give. West Minister Abbey was not enough for you! Do you grudge my rivalry and my *Ya'd-Ghat* that the nation might erect for me?”

“Meeao”

I cleared my vision and gradually realized that it was none else but a cat that had finished all the milk in my cupboard and had come to vaunt her victory under my very nose. What should I say, I could not decide. Whose milk was this? It was neither of my father nor of the milk maid, but of the cow to which I and the cat had the same right. There was nothing to be enraged at. But tradition tells us that whenever you find a cat, chase her with a stick irrespective of her intentions. I could not possibly bring curse on my tribe by breaking this tradition, nor could I bear the idea of being dubbed a coward. So, much against my will, I set aside the *hookah* and, with great difficulty getting hold of a broken leg of a charpoy, was about to hurl at it when with complete nonchalance and in a clear silvery tone she said “Strike, but hear”.

I was spellbound. She continued, “You men taste milk, butter, curd, fish, and flesh from far and near, and we are to starve because you are men and we are cats! Where is the difference between cats and men? The same hunger prompts us to be in quest of food. Nature has provided us with four feet and fleet which expedite our search. Call it theft if you like, but I am highly benefited by drinking your milk and you have acquired great merit in heaven through the satisfaction of my appetite. So, I am the source of your virtue.”

“Am I a thief, and if so, is it my choice? People having plenty to eat and drink and to lay by do not willingly part with even the crumbs of their bread to feed the poor, but they will spend millions to entertain the opulent. There are, no doubt, few exceptions; they will import cats of lordly tribe from Newzeland or America and lavishly spend for their maintenance, the only purpose of which is to make a parade of their wealth. The surplus wealth of the rich and the hoarded gold of the miser can well be spent on the common cat”

My patience almost came to an end and I cried out, “Tarry ye learned quadruped! Your words sound either socialistically communistic or communistically socialistic, which I can not quite decipher. But one thing I understand; the rich should try to be richer by all means to make the country richer. Society should raise its standard of living in that way.”

At this the cat showed her teeth and burst out, “Do you raise the standard at the cost of life? What do I care for your standard of life if I starve?”

The attitude of the cat was not very encouraging. It is useless to try to convince a dilectician or a judge if they are bent on not to understand. I conceded her that right of immunity.

She continued, "If a judge is to punish a thief, laws should be so framed that the judge should starve for three days and, during this period if he does not feel the necessity of saving his life even by stealing, then only punishment will be lawful."

When defeated in a wrangle, the wise should end in homily. I told her, "If you want to improve your soul, I can supply you with a number of treatises on social justice including the collection of my lectures which have run into millions."

Perhaps in the mean time my milk was acting on her brain and she appeared to be appeased. She crouched and waved her tail and said, "If I get milk I need no books, for who would be able to understand books without milk or the like?"

I relapsed into my reverie once again but without the hookah and wondered whether the cat was contemplating an all India Federation of Cats!

Rathin Basu, Class XB



Math. Reading. Confidence.

FREE PLACEMENT TEST

Kumon of Foxfield

6262 South Parker Rd., Ste. 100
Centennial, CO 80016

720.870.0547
kumon.com/foxfield

Kumon of Highlands Ranch East

9362 S. Colorado Blvd.
Highland Ranch, CO 80126

303.683.3339
kumon.com/highlands-ranch-east

KUMON®

সিনাইয়ের সূর্যোদয়

গৌতম সরকার

এত সুন্দর, এত মনোরম জায়গা আমি সত্যিই আর কোথাও দেখিনি। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। পাহাড়ের রং পাটকিলে, আর সমুদ্রের, অবশ্যই নীল। কিন্তু সূর্যের আলোয় সেই পাটকিলে আর নীল রঙের যে কত 'রকম' আর বাহার হয় তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর , চারি দিকে শুধু বালি আর বালি। এতো বালিও ছিল এ পৃথিবীতেওদিক কিছু ক্যাকটাস -তারই মাঝে এদিক ? ছাড়া ভাবে। এখানে ওদের -গজিয়ে আছে খাপ ;জাতিও গুলু উপস্থিতিটা কেমন যেন অযাচিত অতিথির মতো। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। দেখে মন ভরে গেল। কিন্তু এখানে আসার আগে এইসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। যে জন্যে সিনাইপেনিনসুলায় এসেছিলাম-, তা হল একটা 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখা। আর তা দেখতে হলে সারা রাত ট্রেক করে উঠতে হবে মাউন্ট সিনাই বা মাউন্ট মোসেসের ওপর, যার কোলে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চার্চ, "সেন্ট ক্যাথরিন"। এই পাহাড়ের ওপরেই নাকি মোসেস স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে 'টেন কমান্ডমেন্টসের' (10 commandmentsনির্দেশ পেয়েছিলেন (, যা কিনা পরবর্তী কালে হোয়ে ওঠে খ্রিস্ট ধর্মের অখ। এইসব -ক-আ-জটিল তথ্য হজম করার ক্ষমতা বা বুদ্ধিমত্তা, কোনটাই আমার নেই। যেটা ছিল তা হল ঐ 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখার একটা ইচ্ছা। 'অসাধারণ' এই কারণে, যে সূর্যটা নাকি পাহাড়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে উদয় হয় , পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে যা কি না মনে হয় যেন পায়ের তলা থেকে সূর্যোদয়। দার্জিলিঙের মাউন্ট ' থেকে আলাস্কার 'টাইগারহিল' 'ম্যাকিনলে, কন্যাকুমারিকার ত্রিসাগরের সঙ্গম থেকে - কেপ অফ গুড হ' আফ্রিকার-সাউথ'োপ', আমার মিনেসোটার বাড়ির কাছের গ্রেটথেকে 'সুপিরিয়র' লেক- 'টিটিকাকা' লেক-বলিভিয়ার পৃথিবীর উচ্চতম, রাজস্থানের মরুভূমি থেকে আফ্রিকার সাহারা, অ্যারিজোনার -গ্র্যাণ্ড' 'উলুরু' থেকে অস্ট্রেলিয়ার 'ক্যানিয়ন-রক, এমনকি পেরুর অ্যামাজন জঙ্গলের তেও সূর্যোদয় বা'মাছুপিচু' সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; কিন্তু তাই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে? নাঃতেনটা আগে কখনো শুনিনি। , এইসব শুনেটুনে ঐ 'ইচ্ছাটা মনে একেবারে জাঁকিয়ে বসলো, লোভটা আর সামলাতে পারলাম না। আর যাই হোক, এটা দেখতে গেলে আমাকে ভগবান বা ধর্ম বোঝার মতো কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে না, যা কিনা আমার একেবারেই নেইতাই ঠিক করে ফেললাম !, যে এটা না দেখে আমি মিশরদেশ ছেড়ে নড়ছি না। কিন্তু আমি ঠিক -

করলেই বা কি? সেখানে যাব কি করে? রাস্তা ঘাটই যে তেমন নেই; যা আছে তা অতি নগন্য, আর তারও বেশীরভাগই নাকি বন্ধ। কেনোনা কেউই যে সেদিকে যেতে চায় না। ওদিকে নাকি পদে পদে বিপদ, যুদ্ধ সংক্রান্ত। কারন আশেপাশের সব দেশই নাকি দাবি করে যে সিনাই-!আর তাই নিয়েই যত খেয়োখেয়ি ,পেনিনসুলা তাদের অনেক কষ্টে একজনকে জোগাড় করা গেল, একটা গাড়িতে 'প্রাইভেট'করে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মুশকিল হল ভাষা সমস্যা; আমার কাছে আরবি যা, ওঁর কাছে ইংরিজিও ঠিক তাইভাঁড়ে মা ' একেবারে যাকে বলে , 'ভবানী! তাই হাতপা নাড়ানোই হয়ে দাঁড়াল বোঝাবুঝির - একমাত্র মাধ্যম। ঠিক আছে, তাইই সই। একদিন ভোরে বেড়িয়ে পোরলাম। প্ল্যান-টা ছিল মোটামুটি এই যে কায়রো থেকে সুয়েজ হয়ে, 'গাফ অফ সুয়েজ' বরাবর দক্ষিণে যাওয়াআর সেই একই পথে ফেরত আসা। অন্য কোনো , দিকে যাওয়া চলবে না। কারন মুশকিল হল আমার অ্যামেরিকান পাসপোর্ট। ঐ জন্যই আমার নাকি 'ইসরায়েলের গুপ্তচর হবার সমূহ সম্ভাবনা। কারন ঐ 'হারামি' অ্যামেরিকাই যে ইসরায়েলকে ইন্ধন যোগায়। যার জোরেই নাকি ইসরায়েলের এত দাপট, আর সেই দাপটেই নাকি ওরা সিনাই পেনিনসুলায়-'বাবু' হয়ে বসে ছিল বেশ কিছুদিন। তিন তিনবার যুদ্ধ করে তবেই সিনাই-পেনিনসুলায় বেশ খানিকটা উদ্ধার কোরতে পেরেছে মিশর। এইসব তথ্য কি আর আমার মাথায় ঢোকে? আমার শুধু ঐ একটাই সম্বল ঐ 'ইচ্ছাটা, ঐ দেখার 'সূর্যোদয়'ইচ্ছাটা। তাছাড়া ঐ ২০০০ বছরের পুরনো, পাছাফাটা লুপ্তির মতো - ,বাকল পরা-কি সব ছাল ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুরের মিস্টার মোসেস যদি তা দেখে থাকতে পারেন, তাহলে অ্যামেরিকায় থাকা এই আধুনিক আমিই বা তা পারবো না কেন? দুপুর ১২টা নাগাদ সেন্ট ক্যাথরিন পৌঁছান গেল-। এই চার্চে নাকি আমার মতো অপবিত্র নাস্তিকের ঢোকা বারণ। কিন্তু আমি যে অপবিত্র তাই বা জানছে কে? ভাবলাম এত দূর যখন এসেইছি, ঢুকেই পড়ি না একবার, কিই বা আর হবে? দেখেই নি না, কি এমন জিনিস আছে এর ভেতরে, যা নিয়ে কিনা মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদীদের মধ্যে এত লাঠালঠি, এত খিটকেল। তাছাড়া পয়সা উসুল করারও তো একটা ব্যাপার আছেখর্চাস্ত-এতো খরচ , করে এলাম এ্যাদুর কিন্তু ঐ যে বিবেক বলে কি যেন একটা আছে না !...? তার জোরাজুরির কাছেই হেরে গেলামকেন জানি না মনে হল ! আমি এই গির্জায় ঢুকলে বাড়ি বয়ে এসে জোর ,যেকরে

কাউকে অসম্মান করা হবে। তা আমি পারবো না। তাই বাইরে থেকেই দেখলাম। বেশ দেখতে। অ্যামেরিকার মতো বড়, আর নতুন বা দ্রুত' কোনো দেশে থাকলে যা হয়; ৫০০ মাইল কোন দূরত্বই নয় কিন্তু ৫০০ বছর অনেক দিন ! তাই দুই হাজার বছরের পুরনো কিছু একটা দেখছি, ভেবে মনে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ আর শিহরন হলো। কিন্তু ব্যাস, ঐটুকুই। স্পিরিচুয়াল কিছুই অনুভব কোরলাম না। মনে মনে একটু হাসলাম, কোন 'স্পিরিট' থাকলে তবে না 'স্পিরিচুয়াল' কিছু অনুভব করা যায়, আমার যে এইসবের 'কিসুই' নেইউল্টোদিকে ছোটো ! একটা টিলার ওপরে একদল খ্রিস্টান লোককে কোন একটা প্রার্থনায় মগ্ন দেখলাম। ওরা যেইসব মন্ত্র আউড়াছিলতার মধ্যে কেমন , যখন ;যেন একটা শান্তির বার্তা ছিল। ঠিক যেমনটা হয় 'গলায়' কেউ তেমন , করে 'তেমন' সংস্কৃত মন্ত্র বা স্তোত্র আমার ছোটবেলায় মহালয়া শুনে ঘুম ! করতে পারেন 'পাঠ' বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সে , থেকে ওঠার কথা মনে পড়ে গেল কি অসামান্য দক্ষতায় স্তোত্র পাঠভেবেই গায়ে কাঁটা ! দিল। ওঁদের দু'এক জনের পরনে সাদা আলখাল্লার মতো - কিছু একটা মনে হল, হয়তো ওঁরাই পুরোহিত। ওঁদের সাথে গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করলো, তারপর ভাবলাম না থাক, ওঁদের প্রার্থনা ভঙ্গ করবো না, আমি তো আর সে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারলাম না, ওঁদের পথেই বা বাধা হবো কেন? এদিক ওদিক ফ্যা ফ্যা কোরে ঘুরে বেড়লাম বেশ খানিকক্ষন। ভাবছিলাম ভগবান বেচারিকে নিয়ে এত মারামারি কেন? নাকি মারামারিটা আসলে জমি দখলের, এই সিনাইপেনিনসুলার দখল নেবার মতো-? আমার তিন মেয়ের কথা মনে পরে গেল। আচ্ছা, ওরা যদি কোনোদিন আমাকে নিয়ে মারামারি শুরু কোরে দেয়, তাহলে আমি কোন দিকে যাব? বেচারি ভগবান, ওঁর যে কি নিদারুন অবস্থা আর তাঁর , উনার তো নিজেরই অশান্তির শেষ নেই ! একটা আরব ? কাছেই কিনা লোকে শান্তি ভিক্ষা করে বেদুয়িনকেও দেখলাম, উটের পিঠে করে যাচ্ছে। রোদে চটা , আর হার গিল , তামাটে গায়ের রং-কালচে গিলেরুক্ষ , খেতে পায় না বোধহয় ; চেহারা। গায়ে শতছিন্ন জামাকাপড়। দেখে মনে হয় বছর কয়েক স্নান করেনি ওএদিকে জলই , পায় দেখলাম ছোপ ছোপ মেরে সাদা খরি ? বা পাবে কোথায় গায়েও নিশ্চই বোঁটকা গন্ধ। ওর উটের পিঠেও , উঠেছে একটা শতছিন্ন শতরঞ্চির মতো কিছু একটা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যই বোধহয়। দেখে মায়া হল। সাথে তেমন কিছু নেইও যে ওদের দেব। আচ্ছা, ওর কি বউ আছে? ছেলে, মেয়ে? তারা কি খেতে পায়? সুখ যে নেই তা তো দেখাই , ? সেটা কি আমার থেকে ওরই বেশী ? কিন্তু শান্তি , যাচ্ছে

সামনে একটা কুঁড়েঘর আর তাঁবুর মাঝামাঝি কিছু একটা দেখা গেল। ওরই হবে বোধহয়। ওখানেই কি ওর শান্তির সংসার , ছিটিয়ে আরও কিছু উট-ছড়িয়ে , ওদিক-এদিক ? গুলু চিবিয়ে জিরোচ্ছে। ওদের চেহারাতেও কেমন যেন 'শান্তি'। দেখে মনে হল যে এই দুনিয়ায় কি ঘটছেন , 'আপাত অশান্ত' তাতে ওদের বোয়েই গেলো। এই , ঘটছে পেনিনসুলায়-সিনাই ভরপুর শান্তি খুঁজে পেলাম 'এই আমি' ! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ঐ দিয়েই আমার বুকটাকে 'শান্তি' ভরে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ! আবার কবে যে সুযোগ হবে , সেখানেও বিপত্তি। গাড়ির ড্রাইভার এসে তাগাদা লাগালো, জানালো যে এবার মাউন্ট সিনাই রওনা না হলেই নয়। নয়তো ওখানে আর সময় মতো পৌঁছানো যাবে না, কারন ওঁকে যে আবার এদিকেই ফেরত আসতে হবে রাত কাটাতে, আমি যখন সারা রাত ট্রেক কোরবো; কারন মনুষ্য সভ্যতা নাকি এখানেই শেষশান্তি খুঁজে পাওয়াটা কি এতই , আচ্ছা ! ? কি আর করা !... যদি বা এখানে একটু সুযোগ হল ? দুষ্কর বেরিয়ে পরলাম। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে গেলাম মাউন্ট সিনাই। মনে মনে একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম, পারবো তো? Driver তো আমায় পাহারের কোলে ফেলে রেখে কেটে পরবে, আর তারপর? কিন্তু ওখানে গিয়ে বেশ কিছু ইউরপিয়ান বিদেশীদের দেখে ধড়ে যেন একটু প্রাণ এল ! তারা দেখলাম সব একেবারে বিলকুল তৈরী, ট্রেকিং এর - সরঞ্জাম নিয়ে। আর আমি-সাজ? সাথে শুধু একটা জলের বোতলই যে বলে না !, বাঙ্গালীদের কিসসু হবে না আমিই ! গরম উদাহরণ-তার হাতে। এখানে নাকি এখন সব জিরোচ্ছে, খানাপিনা অউর, বিদেশীদের যা হয়, চুমুচামা। - দেখলাম সবই চলছে বেশ ভালো রকম। আমি কি করি, কি করি ভারতে ভারতেই বিরক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু একা একা যে এগিয়ে যাবো , তার সাহসও নেই বুকো। এখানে এসেছি তো একাই কিন্তু তারপর থেকে এই , একাকীত্বের ভয়টা কেমন যেন গ্রাস করতে শুরু করেছে আমায়। আর তার ওপর এই ইউরপিয়ানদের দেখে আমার অবস্থা যাকে বলে , 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া'। কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম তা হল এঁরা রাত ১১টা নাগাদ ট্রেকিং- শুরু করবে, ওপরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ৪ কারণ , টো। তার বেশী দেরী করা যাবে না- ভোরের আলো ফুটতে শুরু করে দেবো। এইসবের কিছুই ৯ আমার জানা ছিল না। কেবল জানতাম যে সকাল-টার মধ্যেই আমায় নেমে আসতে হবে, কারন ড্রাইভার আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। শুনে সকলে বললো যে ওটা নাকি কোন ব্যাপারই না, সূর্যোদয় ৬টার মধ্যেই শেষ-, তারপর নামতে ঘণ্টা আড়াইতিনের বেশী লাগবে না ,। মনে মনে ঠিক কোরে নিলাম যে এঁদের সাথেই উঠবো। রাত ১১-

টা নাগাদ ওপরে ওঠা শুরু হল। খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে ,
,কিশোরী যেন। ওর রূপের ছটায় চারিদিক রূপালী-রূপসী
চিক চিক করে চলকে পরছে সেইরূপ। সেই উপচে পরা
রূপের আলোয় পথ দেখেআর মনে মনে আমাদের সকলের ,
প্রিয়'সলিলদা'র "আমরা সবাই মিলে সূর্য দেখব বলে"
গানটা গাইতে গাইতে যখন ওপরে গিয়ে পৌঁছালাম,
ততক্ষণে চাঁদ অনন্ত যৌবনাআর আমার জিভ বেরিয়ে এই ,
চল্লিশোর্ধ আমি চিতপটাং ওপরে বেশ ঠাণ্ডাকিন্তু ঐ ,
ঠাণ্ডাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো। চাঁদের
আলোটা উপভোগ করতে করতে রবীন চাটুয্যের সেই সুরটা
মনে পরে গেল, তালাত মাহমুদের গাওয়া "চাঁদের এত
আলো"। নিজেই খুব ভাগ্যবান মনে হলো, যোগ্যতার
নিরিখে জীবনে তো কতো কিছুই বেশী পেয়ে গেলাম।
ভারতে জন্মানোর সূত্রে এই গানটা, আর অ্যামেরিকায়
থাকার দৌলতে মাউন্ট সিনাইঅন্তত !একেই বলে কপাল !
আমার দাদা আর ভাইটাকে সাথে রাখতে পারলে হয়তো
'গিল্টি ফিলিংস' এতটা হতো না। কি আর করা যাবে,
সেটাও আমার কপালছোটবেলায় সহজপাঠে বা কিশলয়ে !
পড়েছিলাম"একা একা খেলা যায় না, ঐ বাড়ি থেকে
কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়", আমার সেইটাই মনে পড়ে
গেল। চাঁদের আলোটা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল, আর
আকাশটা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে লাগল।
আকাশের রঙ বেগুনী থেকে গোলাপি, গোলাপি থেকে
কমলা, কমলা থেকে লাল, আর তার সাথে সাথে আরও
কতরকমের নাম জানা রঙের পরিবর্তন হতে হতে-না-হঠাৎ
সোনালী হয়ে গেল !আর তারই ফাঁকে এক মুহূর্তে পাহাড়ের
তলা থেকে, আমার পায়ের তলা থেকে বেরোল একটা লাল
টুকটুকে রক্তের গোলা, মুহূর্তেই যেটা আবার হোয়ে গেল
এক তাল সোনার দলা। মনে হোল যেন হাতে একটা লম্বা
ঝুলঝুল থাকলেই ওটাকে একটু ছুঁয়ে দেখা যেত ওটা যেন ;
তার এমন !আবার কত দূরেও ,কত কাছে তীব্র রূপ, যে
সেদিকে চোখ ফেরানো যায় না, তাই তা ভাষায় প্রকাশ করা
অসম্ভব। জমায়েত লোকজনদের মধ্যে একটা হুল্লোড় উঠল,
তারপর সবাই চুপ। একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস কোরে নিলো
সকলকে। আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে গেল
বেশ কিছুক্ষনের জন্য। তারই মধ্যে কিছু ছবি তোলা , আর
দুএক মিনিটের একটা ভিডিও রেকর্ড- করা। এরপর নামার
পালা। নামতে গিয়ে কত কিছুই মনে এলো , এই পৃথিবীটা
কত সুন্দর, আমরা শুধুশুধু কেন যে এত ঝগড়ামারামারি -
করি, এই সব। মাথায় একটা চিন্তা ছিলই, যদি গাড়িটা
সময়মত না আসে, কিম্বা একেবারেই না আসে?
মিশরীয়দের সময় জ্ঞানের যা বোলিহারিসময় সন্ধান্ত কিছু !

"ইনসা আল্লা" জিগ্যেস করলেই এরা বলে, অর্থাৎ কোন
ঘটনা সময় মতো ঘটবে কিনা, কিম্বা আদৌ ঘটবে কিনা
তার পুরোটাই র মর্জির ওপর নির্ভরশীল। দায়িত্ব "আল্লা"
এড়ানোর কি সহজ সমাধান। ভারত থেকে সরাসরি এখানে
এলে হয়তো এতটা চোখে পড়তো নাকারণ আমাদেরও ,
তো ঐ একই রকম সময় জ্ঞানযদিও আমরা সচরাচর ,
ভগবানকে এর মধ্যে জড়াই না। কিন্তু জীবনের
খুবই চোখে ?বেশীরভাগটাই অ্যামেরিকায় কাটানর পর
আবার হাসিও পায়। চিন্তাটা নিচে ,বিরক্তি লাগে ,পড়ে
নামার সময় তাই মাথায় বেশ ভালোরকমই ঘুরপাক
খাচ্ছিল। কিন্তু নিচে নেমে দেখি আমার গাড়ি উপস্থিত,
তাতে ঢুকেই গাটা এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে -
পড়েছিলাম তা জানি না, কতক্ষণ যে ঐ ভাবে কেটেছে তাও
জানি না। একটা হৈহল্লায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল-। দেখি আমার
গাড়ি ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের হাতে বন্দুক , মাথায়
পাগড়ী, মুখের বেশীরভাগটাই ঢাকা পরনে মিশরীয় ,
গালেবে'য়া"। ভয়ে রক্ত একেবারে হিম হোয়ে গেল। এরা কি
একেবারে মেরেই ফেলবে নাকি? মেয়ে তিনটির মুখখানগুলো
চোখের সামনে ভেসে উঠল, তারপর সব কিছুই কেমন যেন
ঝাপসা। ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্ন দেখছি না তো? দেখি ওরা
আমার ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে। তারপরই
বন্দুকধারী একজন গাড়িতে উঠে এল, আর তন্ন তন্ন করে
গাড়ির ভেতরটার তল্লাসি নিল। তারপর আমাকেও নামতে
হুকমি দিল। ভয়ে জড়সড় হোয়েথর , থর করে কাঁপতে
কাঁপতে আমি নামলাম। আমার কাছে কিছু একটা চাইল।
আমার ড্রাইভার আমাকে বোঝাল যে ওরা আমার আই. ডি.
চাইছে। আমার পাসপোর্টটা শরীরের একটা গোপন জায়গা
থেকে বার করে ওদের দেখালাম। তখন ওরা আমার দিকে
গভীর পলকে তাকিয়ে থেকেনিজেদের মধ্যে কি সব ,
পাশের একটা ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবুতে ,বলাবলি করতে করতে
ঢুকে গেল। আমার পাসপোর্টটা নিয়েই। তার আগে আমাকে
কি সব বলে শাসিয়ে গেলো, যার অর্থ একটাই হয় যে;
আমি যদি এক পাও নড়িতো আমার , জান খতমা। কিন্তু
নড়ে যাবই বা কোথায়? পাসপোর্ট ছাড়া? বেশ কিছুক্ষণ পর
ওরা ফিরে এলো, আমার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে। ধড়ে যেন
প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু পাসপোর্টটা ফেরত দিলো না। উল্টে
বললো যে জানামোজা সব খোলো-জুতো-কাপড়-। খুললাম।
জামাপ্যান্টের পকেটগুলো ভালো কোরে সার্চ- কোরলো,
জুতো জোড়াও। তারপর বলল যে যেটা বাকি আছে, সেটাও
খুলতে হবে, অর্থাৎ আমার জাঙিয়াটা! আমি ভাবলাম, কি
বিপদ, এটা আবার কেন? ইতঃস্তত করতে লাগলাম। কিন্তু
ওদের আরবি হস্তিত্বি থেকে যা বুঝলাম তা হলো "অত

সহজে চিঁড়ে ভিজবে না চাঁদু, তুমি ওখান থেকেই তোমার পাসপোর্টটা বার করেছে, সুতরাং ওখানে আরও কি কি লুকানো আছে তা আমরা দেখতে চাই”। আমার ড্রাইভারের দিকে আকৃতি নিয়ে একবার তাকালাম, যে তুমি অন্তত এদের ভাষাটা জানো, কিছু একটা করো। কিন্তু ওঁর চোখের ইশারায় যা বুঝলাম তা হল যে, ওরা যা যা বলছে আমার তাই করাই শ্রেয়। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এ আর এমন কি? জিমে সাঁতার কেটে বা র্যাকেটবল খেলে - ;উঠে এমন তো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই করে থাকি পুরুষদের লকারদাঁড়ি ,রুমে সকলের সাথে উদ্যোগ হয়ে স্নান করি- কামাই। এমনটাই তো করে আসছি অ্যামেরিকায় কলেজে পড়তে যাওয়া ইস্তকওখানে তো এটাই রেওয়াজ। সুতরাং ! এতে আর ঘাবড়ানোর কি আছে? বুঝতে পারলাম যে আমার এই অ্যামেরিকান পাসপোর্টটাই এই মুহূর্তে আমার যত বিপত্তির কারণ। তাই ওদের বোঝানোর চেষ্টা কোরলাম যে আমি আদতে ভারতীয়। কায়রোআর মিশরের অন্যান্য , বেশ কিছু জায়গায় দিন কয়েক আগেই ঘোরার সুবাদে জানতাম যে এই মিশরীয়রা আমাদেরবলিউডের ছবির খুব ভক্ত ;টিভিতে এখানে সারাদিনই হিন্দি ছবি দেখানো হয় , আরবি-সাবটাইটেল সমেত। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে ভারতীয়দের ওপর , বিশেষ করে তেমন কোন রাগ নেই এমনকি চীনাাদেরও নয় যদিও এখনো আমার পাকিস্তান ভ্রমণের সৌভাগ্য ; হয়নি। বরং-শিষ্ট-শান্ত আমাদের সম্পর্কে অনেকেরই , এই ধরনের একটা ধারণা আছে। তাই আমার বিশিষ্ট-ল্যাজ ভারতীয়ত্ব বোঝাতে বলিউডের চিত্র তারকাদের নাম করে আবোলতাবোল বোকতে শুরু করলাম। হয় তাতেই কাজ - ,হোল নতুবা আমাকে ওদের এক বন্ধ ;উন্মাদ বলে মনে হল- আমার ওপর ওদের সন্দেহটাই বোধহয় চলে গেল। আমার আর জাঙ্গিয়া খোলার দরকারই হল নাপাসপোর্টটা ফেরত ! পিঠে একটা চাপড় মেরে এক বন্দুকধারী বললো ,দিয়ে প্যান্ট পরে নিতে। চটপট তাই করলাম। তারপর ওরা -জামা আমার ড্রাইভারের সাথে কি যেন একটা মিটিং করল, আমার সামনেই। ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকে, সাথে যে ম্যাপ নিয়ে গেছিলাম, তার ওপর আঙুল দিয়ে দিয়ে আমাকে বোঝাল যে আমরা যে রাস্তা দিয়ে আগের দিন এসেছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য ঘুরপথে ফিরতে হবে। শুধু তাই - নয়, আমরা যাতে ওদের সাথে কোনরকম ছলাকলা করে - অন্য কোনো দিকে চলে না যাই, তার জন্য ওরা ওদের লোক পাঠাচ্ছে একটা যুদ্ধজীপে-, ওরা সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা শুধু সেই পথেই ওদের অনুসরণ করে যেতে পারবো, নচেৎ নয়। আর বেশী ব্যাগোরবাই করলেই,

চিসুম; কেউ আমাদের টিকিটিও খুঁজে পাবে না সব ! কিছুতেই রাজি হলাম। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। একজন এসে হুমকি দিল যে আমার ক্যামেরাটা এখানে রেখে যেতে হবে। সে কি? তা কি করে সম্ভবআমার যে মিশরের অনেক ? ক্যামেরা ছাড়া চলবে কি !জায়গাই ঘোরা বাকি এখনো করে? আমার এতো সাধের মাউন্ট সিনাইয়ের সূর্যোদয়ের ছবিগুলোও তো এরই ভেতর! কাকুতি মিনতি করলাম। কোন লাভ হোল না। ওদের কথা হোল যে ওরা চায় না যে আমি এখানকার রাস্তাঘাট, চেকপোস্টের ছবি তুলি বা সেইসব ছবি এখানকার বাইরে যাক। আমি বললাম ঠিক আছে, তাই সেই। কথা দিলাম যে আমি এই তল্লাটের আর কোন ছবি তুলব নাআর , তোলা ছবিগুলোর মধ্যে আপত্যিকরগুলো ওদের সামনেই মুছে দিচ্ছি। ওরা বললো ঐ যে সামনে জীপে আমাদের লোক তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা কোরছে, ওরা কি তোমার মামা? যে তোমায় ছবি মোছার জন্য সময় দেবে? আমার দেওয়া কথার ভিত্তিতে যদিও বা ক্যামেরাটাতে ছাড় দেওয়া যায়, ওর ভেতরের ছবি সমেত মেমোরিকার্ডটা কিছুতেই ওরা - এখান থেকে বেরতে দেবে না। কি করবো? ঐ কার্ডটাতেই রফা করলাম, ওটা বার কোরে ওদের দিয়ে দিলাম। যে সূর্যোদয়ের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়; সেই সূর্যোদয়ের ছবিগুলো সমেত, সেই সূর্যোদয়ের একটা ভিডিও সমেত! বুকটা ফেটে গেল। তারপরও রেহাই নেই। ওরা জিপেস করলো যে সাথে আর কটা কার্ড আছে? সেখানে এখানকার রাস্তাঘাট বা চেকপোস্টের ছবি তোলা আছে কিনা, ইত্যাদি। মোদা কথা যা বুঝলাম তা হল এই যে, ভালোয় ভালোয় এরা শুধু আমার প্রাণটা নিয়েই এখান থেকে আমায় ফেরত যেতে দেবে, অন্য কিছু নিয়ে নয়। বাকি কার্ডগুলোও দেখালাম, ওরা বুঝল যে ওগুলো খালি। তারপর শুরু হল সামনের ঐ জীপটাকে অনুসরণ করা। প্রাণের ভয়, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিনাই- পেনিনসুলার সে কী অপকল্প রূপ, যা দেখে কিনা একটা প্রাণভয়ে ভীত মানুষও মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। অবাক চোখে - চারিদিক দেখছিলাম। বিভিন্ন চেকপোস্টের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিলো। মাঝে একবার মনে হল যে আদৌ ঠিকঠাক যাচ্ছি তো? নাকি এই সবই আমাকে ভাঙ্গিয়ে কিছু ডলার কামাবার ষড়যন্ত্র? কে জানে, আমাকে হয়তো এরা কোনো 'মাল'-দার পাঠি ঠাউরেছে'মাল' আর আমি !-দার না হলেই বা কিএকটা দম বন্ধ !আমার দেশ অ্যামেরিকাতো বটে ? করা ভয় চেপে বসতে শুরু করলো বুকো। আর ঠিক তখনই একটা মতলব এলো মাথায়। আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে একটা কিছু অন্তত রেখে যাই আমার

মেয়েগুলোর জন্য, যাতে ওদের জানার একটা স্কীপ সম্ভাবনা থাকে যে ওদের বাবা কোথায় বেঘোরে প্রাণটা দিয়েছে। যেই ভাবা, অমনি কাজ। ক্যামেরায় একটা কার্ড ভেরে তাতে আমার একটা ছবি তুললাম, একটা মোক্ষম 'সেক্সি'! সাথে আমার ড্রাইভারেরও একটা ছবি। একটা ভিডিও রেকর্ড করলাম, কি অবস্থার মধ্যে পরেছি তার একটা ছোট বর্ণনা দিয়ে। তারপর সেই কার্ডটা ক্যামেরা থেকে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। ভালো কেউ যদি এটা কুড়িয়ে পায়, এই আশায়হঁটাং সামনের জীপটা দাঁড়িয়ে পরলো !, সেই অনুযায়ী আমরাও। আর ঠিক তখনই আমার খেয়াল হোল যে আমি এই মাত্র ওদেরকে দেওয়া কথার খেলাপ করেছি এই তল্লাটের কোনো ছবি তুলবো না বলেও তার , ছবি তুলেছি। আমার আত্মারাম খাঁচা। ভাবলাম এই রে , ওরা নিশ্চই দূরবীন দিয়ে আমার ছবি তোলা বা কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলার কীর্তিকলাপ দেখেছে; এবার তার জবাব চাইবে। আমি কি জবাবদিহি করবো? এখন কি করিজীপ থেকে ? দুজন বন্দুকধারী নেমে পেছনে আমাদের গাড়িটার দিকে আসতে লাগল। আমি শুধু আমার হার্টবিটগুলই শুনতে পারছিলাম। ওরা এসে জানাল যে আমরা একটা জাংসনে

এসে পড়েছি। ওরা আর আমাদের পথ দেখাবে না। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরলে ঘুর পথে সুয়েজ হয়ে কায়রো পৌঁছে যাব। আর কোনরকম বেয়াদবি কোরে বাঁ দিকে যাবার পায়তারা কষলেই, টিসুম; এই বালির গহ্বরেই সব শেষ ! ওরা ওদের জীপে ফেরত গিয়ে ঠায় বসে রইলো, আমরা কোন রাস্তা ধরি তা দেখার জন্য। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে মানে মানে কেটে পড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনিটা আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনটার থেকেও বেশী জোরে ছুটছিল আরও বেশী জোরে শব্দ করে যেন,। বেশ কিছুক্ষন ঐ ভাবে যাবার পরকায়রোর দিকে যাবার একটা , সাইন চোখে পরলো। ধরে প্রাণ ফিরে পেলাম, আবার। তারপরই বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে এ যাত্রায় বোধহয় আর প্রাণের ভয় নেইখানিষ্কণ পরে খেয়াল হল য :ে আমার গায়ের জামাটা ভিজে চুবুর !সপসপ করছে ঘামে , ঐ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার পর ;সাথে একটা অনুভূতিও হল অনেকটা সেইরকম। ,যেমন হয়-: এই প্রতিবেদকগৌতম , বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার বাসিন্দা। ,সরকার সালে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ২০১২ ,এটি ফেব্রুয়ারি





Art is not what you see, but what you make others see

Shohini Ghosh - www.shohini.com

Fall is always peppered with college admissions, parents decorating teenager's first dorm rooms and freshman posting pictures of their first wild parties with or without their parent's knowledge on Instagram and Facebook. The freedoms of young adulthood that will now remain with you on your life's long journey that each human set out on.

Takes me back 25 odd years when I was graduating high school from St. Xavier's Mumbai. A most prestigious ceremony organize in the historic St. Xavier's Campus in Mumbai. Bright eyed very opinionated and full of adventure, nervously giggling at realization that life as a teenager was fast becoming a part of my history. What was to be my future?

I chose sculpture at a time when all around me the multitude thronged to join Medicine or Engineering colleges.

Going against the tide and picking art as a vocation was not a second option but more a life calling this I knew would be infinitely challenging every waking day of my life and would give me the most peace. I pursued Sculpture at J.J. school of art Mumbai.

Rewarded for non-conforming by being invited by the University to lecture the graduating class of 1994 at the University of Mumbai, India; I was the youngest professor in the University of Mumbai in the 1990's. I am an American Sculptor of Indian origin now. My art is usually a stylistic representation of genre subjects.

I create sculptures in bronze that can be best described as Figurative, stylistic representation of moments in life, a zeitgeist of my surroundings. I use the human body to express and create physical images as a metaphor for the language of the soul (life-force), the illustration of our uniqueness as a human race, our quest to build families, communities and societies that define our existence.

A little excerpt of a famous poem for our creative minds as to what is important in life:

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free; Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth; Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Follow your dreams as I believe everyone wants Happiness, no one wants pain, But remember you cannot see rainbows without a little rain.

My sculptures around the world.



Bronze Sculpture "Aspirations" In Gillette WI



Bronze 'Gossip' Sioux falls SD & Breckenridge CO



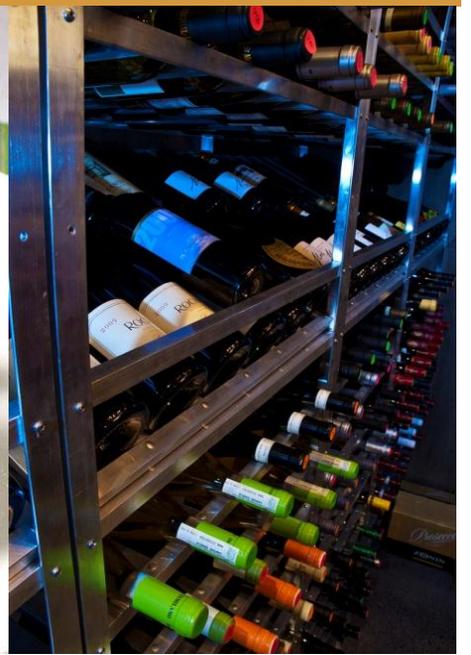
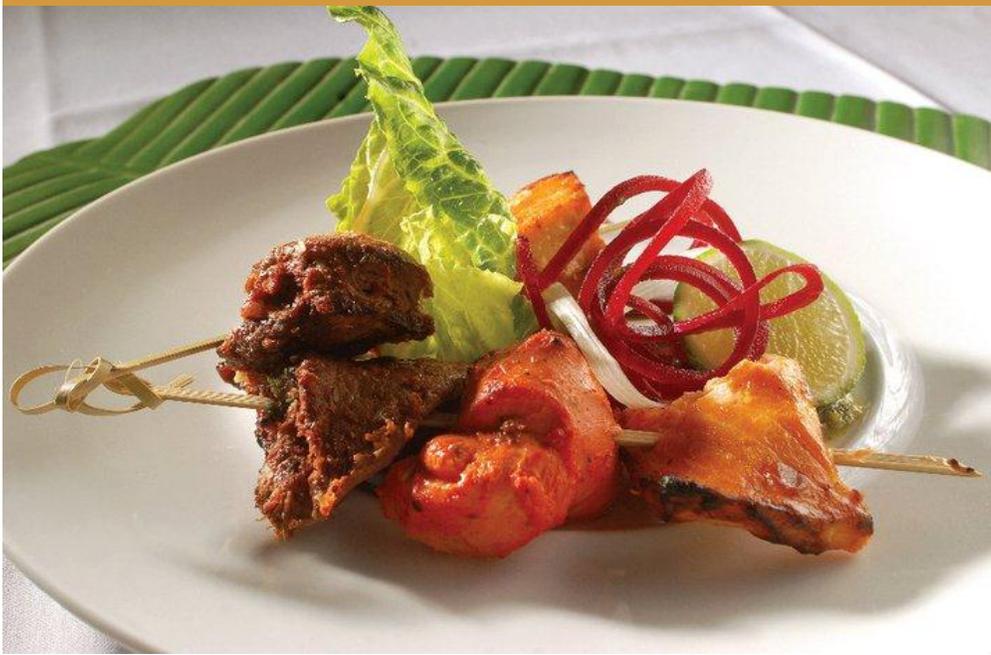
10' Bronze 'Class Act' Changchun China



Bronze 'Cut' Lords Cricket Club UK

AZITRA

Indian Culinary Nirvana



sthaufer TEAM REAL ESTATE

www.stauferteam.com

932 Main Street, Louisville, CO 80027

303-664-0000

Our Colorado Licensed Realtors have over 175 years of experience selling real estate.

We have extensive market knowledge of the Boulder, Broomfield, Jefferson, & Weld County areas.

Whether you need help buying, selling, or leasing property, we would love to help you with all of your real estate needs.



*The **BIG RED TRUCK** is available to our clients and to non-profits for **FREE!***



Staufer Team Real Estate
932 Main Street
Louisville, CO 80027

Office: 303-664-0000
Fax: 303-664-0007

Email: info@stauferteam.com